দাম : পাঁচ টাকা

স্বস্তিকা

৬৪ বর্ষ, ২০ সংখ্যা।। ১৬ জানুয়ারি ২০১২, ১ মাঘ ১৪১৮

বাঙালির শীত-পার্বণ

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ❑ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ❑ ৬-৭

মুখ্যমন্ত্রীর মতো 'স্বচ্ছ রাজনীতিক' খুঁজে পাওয়া যাবে না? ❑ ৮

লোকপাল প্রহসন ❑ তারক সাহা ❑ ৯

বাংলা খুঁজছে নতুন কাণ্ডারী ❑ শ্যামল কুমার হাতি ❑ ১১

আগরতলায় স্বয়ংসেবক সম্মেলনে মোহন ভাগবত : 'ভারতমাতার সুরক্ষার জন্য হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করুন' ❑ ১৩

বাঙালির শীত-পার্বণ ❑ অর্ণব নাগ ❑ ১৪

শীতের মেলা ❑ নবকুমার ভট্টাচার্য ❑ ১৭

রাজনীতিতে কেলেঙ্কারী ❑ যোগিন্দর সিং ❑ ১৯

খোলা চিঠি : জোটের আয়ু কমছে, চলছে ঘুঁটি সাজানোর খেলা ❑ সুন্দর মৌলিক ❑ ২১

হিন্দু ছাত্রীদের বিভ্রান্ত করে গোমাংস খাওয়ানো : ক্ষোভের আগুনে পুড়ছে বাংলাদেশ ❑ ২৭

অসম : খোদ মুখ্যমন্ত্রী সরব জমি-দুর্নীতি নিয়ে ❑ ২৭

কলকাতায় প্রথমবার আয়োজিত 'শিশু চলচ্চিত্র উৎসব-২০১২' ❑ দেবাদিত্য চক্রবর্তী ❑ ৩১

হিন্দুদের পকেট কেটে মুসলমানদের লিল্লাইর বাক্স পূর্ণ হচ্ছে ❑ শিবাজী গুপ্ত ❑ ৩৪

নিয়মিত বিভাগ

এইসময় : ১০ ❑ **অন্যরকম : ১৮** ❑ **চিঠিপত্র : ২২** ❑ **ভাবনা-চিন্তা : ২৩** ❑ **পরম্পরা : ২৫-২৬** ❑ **রাজ্যে রাজ্যে : ২৮** ❑ **সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০** ❑ **শব্দরূপ : ৩২** ❑ **চিত্রকথা : ৩৩**

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

বাঙালির শীত–পার্বণ
পৃঃ ১৪-১৭

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৪ বর্ষ ২০ সংখ্যা, ১ মাঘ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৩, ১৬ জানুয়ারি - ২০১২

দাম : ৫ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail :
swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাদের সহৃদয় পাঠকদের জানাচ্ছি, গত কয়েক মাসে নিউজপ্রিন্টের দাম এবং কাগজ ছাপার আনুষঙ্গিক খরচ যেভাবে ক্রমশ বেড়ে চলেছে, তাতে বর্তমান মূল্যে স্বস্তিকা আপনাদের হাতে দেওয়া দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। এই অবস্থায় নিরুপায় হয়েই আগামী ২৩ জানুয়ারি (৬৪ বর্ষ, ২১ সংখ্যা) সংখ্যা থেকে সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকার দাম ৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭ টাকা এবং বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩২৫ টাকা করতে বাধ্য হচ্ছি। পত্রিকার এই আর্থিক সংকটময় মুহূর্তে পাঠকবর্গের একান্ত সহযোগিতা আমাদের একমাত্র কাম্য। বিগত ৬৪ বছর ধরে আপনাদের সহৃদয় চিত্তের যে প্রেরণা স্বস্তিকা-কে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, তা থেকে আমরা বঞ্চিত হবো না— এই প্রত্যাশা রইল।

—স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : 'বই উৎসব ও আমরা'

বই নিয়ে যে উৎসব করা সম্ভব সেটা কলিকাতা পুস্তক মেলা বুঝিয়ে দিয়েছিল তার সূচনালগ্নেই। তারপর ৩৭ বছর পেরিয়ে এসেছি আমরা। বইমেলার বার্ষিক আয়োজন নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। তবে বই-অনুরাগীদের উৎসাহ উদ্দীপনায় 'কলকাতা বইমেলা' আজও অম্লান। ইদানীং কলকাতার কয়েকটি এলাকায় আঞ্চলিক বইমেলাও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এসব নিয়েই আমাদের বইমেলা সংখ্যা — 'বই উৎসব ও আমরা'। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লিখেছেন—

রমাপ্রসাদ দত্ত, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, নবকুমার ভট্টাচার্য ও অর্ণব নাগ।

সঙ্গে অন্যান্য আকর্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে থাকছে পুস্তক সমালোচনা ও নেতাজীর ১১৬তম জন্মদিনে তাঁর প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি, নিবেদনে ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত।

সম্পাদকীয়

পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন

পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। দিনক্ষণ ঘোষণা হইয়া গিয়াছে। উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পাঞ্জাব, মণিপুর ও গোয়া—এই পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন পুরা ফেব্রুয়ারি মাস জুড়িয়া চলিবে। ফলাফল ঘোষণা হইবে একই দিনে ৬ মার্চ। দেশের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে এই পাঁচটি রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফলে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস নেতৃত্বের গায়ে খুব একটা আঁচ লাগিবার কথা নহে। কেননা এই পাঁচটি রাজ্যের তিনটিতেই ক্ষমতাসীন রহিয়াছে বিরোধীরা। উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতায় রহিয়াছে মায়াবতীর নেতৃত্বাধীন বহুজন সমাজ পার্টি; উত্তরাখণ্ডে বিজেপি এবং পাঞ্জাবে আকালী দল-বিজেপি জোট। মণিপুরে কংগ্রেস এককভাবে থাকিলেও গোয়ায় এই দলের সহিত ক্ষমতার ভাগীদার রহিয়াছে এন সি পি-ও।

বর্তমান এই রাজনৈতিক চালচিত্র দেখিয়া মনে হইতে পারে কংগ্রেসের বোধহয় হারাইবার কিছুই নাই। কেননা মণিপুর ও গোয়া— এই দুই ক্ষুদ্র রাজ্য ছাড়া বাকী তিনটি রাজ্যে কংগ্রেস রহিয়াছে বিরোধী আসনে। অন্যদিকে জাতীয় বিকল্প হওয়ার একমাত্র দাবিদার বিজেপি-র এবং সেইসঙ্গে মায়াবতীর বি এস পি-র অনেক কিছু প্রমাণ করিবার দায় রহিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে দেখা এই সমীকরণ হইতে বোধ হয় বাস্তব পরিস্থিতি পুরোপুরি আঁচ করা যাইবে না। কেননা কংগ্রেসের কাছেও এই নির্বাচন কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দল হিসাবে কংগ্রেসের কাছে তো বটেই, তাহার চাইতেও বড় কথা, ব্যক্তি হিসাবে রাহুল গান্ধীর কাছে এই নির্বাচন একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে দাঁড়াইয়াছে। ক্ষমতা দখলে সক্ষম না হইলেও ৪০৩ বিধানসভা আসন বিশিষ্ট দেশের বৃহত্তম এই রাজ্যে একটি সম্মানজনক ফল করা কংগ্রেসের কাছে চালেঞ্জ বৈকি।

এই পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন ইউ পি এ-টু সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণের প্রশ্নেও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। একের পর এক দুর্নীতির ঘটনা প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে এই সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা একেবারে তলানিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। ইহার উপর আন্না হাজারে ও তাঁহার অনুগামীদের ক্রমাগত আক্রমণাত্মক প্রচারে ইউ পি এ সরকার ও কংগ্রেস দলকে প্রায় কোণঠাসা করিয়া দিয়াছে। এই অবস্থায় নির্বাচনে একটি ভাল ফলই কংগ্রেসকে কোণঠাসা অবস্থা হইতে টানিয়া বাহির করিতে পারে। তাই আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে এই নির্বাচন শাসকদল কংগ্রেসের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইতে বাধ্য।

অন্যদিকে দেশের প্রধান বিরোধীদল বিজেপি-র কাছেও এই নির্বাচন একটি অ্যাসিড টেস্ট বলিয়া গণ্য হইতেছে। এই দলের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হইল উত্তরাখণ্ড ও পাঞ্জাবে ক্ষমতা ধরিয়া রাখা। দুই রাজ্যেই অ্যান্টি-ইনকামবেন্সি ফ্যাক্টর যে যথেষ্ট পরিমাণে সক্রিয় তাহা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিয়া পাঞ্জাব ও উত্তরাখণ্ডে ক্ষমতা ধরিয়া রাখিতে পারিলে বিজেপি তাহার স্থিতিশীলতা বজায় রাখিতে পারিবে। কিন্তু একমাত্র জাতীয় বিকল্প হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে উত্তরপ্রদেশে বিজেপি-কে অবশ্যই ভাল ফল করিতে হইবে। বস্তুত এই রাজ্য নির্বাচনের ফলাফলের উপর দুই দলের ভবিষ্যৎ অনেকটাই নির্ভর করিতেছে। মায়াবতী ও মুলায়ম এখনও উত্তরপ্রদেশ দুই প্রধান শক্তি। তাহা সত্ত্বেও কংগ্রেস ও বিজেপি যেভাবে সর্বশক্তি লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে তাহাতে আগামী নির্বাচনে কোনও দলের পক্ষেই একক গরিষ্ঠতা পাওয়া সম্ভব কিনা তাহা লইয়া ইতিমধ্যেই নানা আশঙ্কা দেখা দিতে শুরু করিয়াছে।

এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া অন্য একটি আশঙ্কাও মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে শুরু করিয়াছে। বিশেষত নির্বাচনের মুখে মুসলমানদের জন্য সাড়ে চার শতাংশ সংরক্ষণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণা এক নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়াছে। উত্তরপ্রদেশের মুসলিম ভোটব্যাঙ্কের দিকে নজর রাখিয়াই যে কংগ্রেসের এই ঘোষণা তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ইহার শেষ পরিণতি কোথায় গিয়া দাঁড়ায় তাহা এখন দেখার বিষয়। ফলে বিভিন্ন দিক হইতে এবারের এই পাঁচ রাজ্যের ভোট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার ফলাফলের উপর জাতীয় রাজনীতির অনেক কিছুই নির্ভর করিবে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

কোনও অল্পবুদ্ধি বালক শ্রীরামকৃষ্ণের সমক্ষে সর্বদাই শাস্ত্রের নিন্দা করিত। একদা সে গীতার অত্যন্ত প্রশংসা করে। তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "বুঝি, কোনও ইংরাজ পণ্ডিত গীতার প্রশংসা করিয়াছে তাহাতে এও প্রশংসা করিল।" হে ভারত, ইহাই প্রবল বিভীষিকা। পাশ্চাত্য অনুকরণমোহ এমনই প্রবল হইতেছে যে, ভালমন্দের জ্ঞান, আর বুদ্ধি, বিচার, শাস্ত্র, বিবেকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না। শ্বেতাঙ্গ যে ভাবের, যে আচারের প্রশংসা করে, তাহাই ভাল; তাহারা যাহার নিন্দা করে, তাহাই মন্দ, হা ভাগ্য, ইহা অপেক্ষা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় আর কি!

—স্বামী বিবেকানন্দ।

সুইস ব্যাঙ্কের কালো টাকা নিয়ে রাজীব গান্ধীর ভূমিকায় উত্তাল রাজ্যসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ লোকপাল বিতর্ক নিয়ে মাঝপথে মুলতুবি হয়ে যাওয়া রাজ্যসভার অধিবেশন স্বনামধন্য আইনজীবী ও বিজেপি সাংসদ রাম জেঠমালানীর এক মন্তব্যে উত্তাল হয়ে ওঠে। জেঠমালানী প্রয়াত প্রধামন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ওপর সরাসরি আক্রমণ শানান। আন্তর্জাতিক একটি পত্রিকায় প্রকাশিত একটি পুরনো তথ্য উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, ওই বিখ্যাত পত্রিকাটি তৎকালীন সুইসব্যাঙ্কগুলিতে থাকা কালো টাকার ১৪ জন মালিকের ছবি প্রকাশ করেছিল। অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে প্রবীণ সাংসদ জানান ''আজ বলতে লজ্জা হয়, প্রকাশিত ছবিগুলির মধ্যে ১৪তম ব্যক্তিটি ছিলেন তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী''।

তিনি বলেন, ইচ্ছাকৃতভাবে কংগ্রেস সুইসব্যাঙ্ক থেকে কালো টাকা উদ্ধারে তৎপরতা দেখায়নি। সম্প্রতি সুইজ্যারল্যান্ডের সঙ্গে 'ডাবল ট্যাক্সেশন' এড়িয়ে চলা সংক্রান্ত চুক্তিতে ভারত সরকারের রাজী হওয়াকে শ্রী জেঠমালানী 'জালিয়াতি' বলে আখ্যা দেন। এক সময় তিনি লোকসভা বিষয়ক মন্ত্রী নারায়ণস্বামী ও কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক মনু সিংভিকে সরকারের এই চুক্তি সই করা নিয়ে তীব্র ভর্ৎসনা করে কংগ্রেসের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নিকম্মা রাজনীতিকেই দায়ী করেন। অবস্থা বেগতিক দেখে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মনিশঙ্কর আইয়ার শ্রী জেঠমালানীর বিবৃতিকে সভার কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়ার জন্য অন্য সদস্যদের নিয়ে প্রবল বিক্ষোভ দেখান।

শ্রী জেঠমালানী রাজ্যসভাকে সাম্প্রতিক সম্পন্ন চুক্তির বয়ানের চরম ক্ষতিকর অংশটি সম্পর্কে অবহিত করে বলেন, এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ভারত সরকার কালো ও বেআইনী টাকা উদ্ধারে কেবলমাত্র ভবিষ্যতে ঘটতে পারে এমনই খবরাখবর ও তথ্য আদান প্রদান করার ব্যবস্থা করেছে। অতীতে সংঘটিত এই সংক্রান্ত বিপুল কালো টাকা কারা সঞ্চিত রেখেছে, সেই টাকার পরিমাণ কত সেই সম্পর্কে ভারত সরকার নিস্পৃহ থাকবে। এই নিস্পৃহতাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে তিনি আখ্যা দেন। বিতর্কের মধ্যে কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক মনু সিংভির দেওয়া একটি উদ্ধৃতিকে কেন্দ্র করে শ্রী জেঠমালানী একটি চমৎকার প্রত্যুত্তর দিয়ে রাজ্যসভার বিতর্কপর্বকে বিরল মাত্রায় নিয়ে যান। তিনি বলেন, শ্রী সিংভি জানিয়েছেন ''পাওয়ার কোরাপ্টস্, অ্যাবসলুট পাওয়ার কোরাপ্টস্ অ্যাবসলুটলি'', কিন্তু তিনি (সিংভি) হয়তো পরিমার্জিত আপ্ত বাক্যটি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন। জেঠমালানীর বিবৃতি অনুযায়ী তা হলো 'পাওয়ার কোরাপ্টস্, বাট দি প্রসপেক্ট অফ লুজিং পাওয়ার কারাপ্টস অ্যাবসলুটলি' (ক্ষমতা দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলে, কিন্তু ক্ষমতা হারানোর ভয় চরম দুর্নীতিগ্রস্ত করে)!

ভারতকে বেকায়দায় ফেলতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বৃদ্ধির কৌশল চীনের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতকে বেকায়দায় ফেলতে এবার অভূতপূর্ব কৌশল নিল চীন। গত ৮ জানুয়ারি চীনের সরকারি মুখপত্রে ভারত-চীন দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে যে কালোছায়া পড়েছে তা কাটিয়ে চলতি বছরে কৌশলগত এবং সহযোগিতামূলক পার্টনারশিপ বৃদ্ধিতে তুলনামূলকভাবে 'ভাল' এবং 'দ্রুত' উন্নয়নের জন্য ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালিত জিনহুয়া নিউজ এজেন্সিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ওই কথা বলার পাশাপাশি চীনের সহকারী বিদেশমন্ত্রী লিউ ঝেনমিন দাবি করেছেন, 'ভারত-চীন দু'দেশের নেতৃবৃন্দের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে কার্যকরী ভূমিকা নিতে, উচ্চস্তরের আদান-প্রদানে, কৌশলগত ভিত্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতা গড়ে তুলতে আগ্রহী চীন। এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইস্যুগুলিকে ঠিকঠাক সামলাতেও যৌথ উদ্যোগের পক্ষপাতী চীন।'

আর এখানেই প্রমাদ গুণছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা মনে করছেন ওই সাক্ষাৎকারে ভারত-চীন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়ার কারণ এই 'সম্পর্ক' ২০১১-তে বারবার মুখ থুবড়ে পড়েছে চীনা আধিকারিকদের সংযমহীন মন্তব্যে। বিশেষ করে কাশ্মীরীদের ভিসা ইস্যু, অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং সহ ভারতের নিরাপত্তা-ব্যবস্থায় চীন যে ত্রাস সৃষ্টি করতে চেয়েছিল তা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেমন নিন্দনীয় হয়েছিল, তেমন দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের বিপক্ষে গিয়ে চীনের বিশ্বাসঘাতক মূর্তিও জনসমক্ষে উন্মোচিত করতে সক্ষম হয়েছিল। তাই রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে আন্তর্জাতিকস্তরে ভাবমূর্তি ফেরাতে এবং ভারতকে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ফাঁদে ফেলে বিশ্বাসঘাতকতার পুরোনো ইতিহাস ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হয়েছে চীন। যে কারণে সরকারের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব নয়, দ্বিতীয় সারির এক নেতাকে দিয়ে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বার্তা দিচ্ছে চীন। চীনের পাতা এই ফাঁদে ভারত পা দেয় কিনা সেটাই এখন দেখার।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নতুন কেন্দ্রীয় সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১৬ থেকে ১৮ ডিসেম্বর ২০১১-তে কেরলের কোচিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় অছি (ট্রাস্টী) পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে পরিষদের কেন্দ্রীয় পদাধিকারীদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। পরিষদের নতুন আন্তর্জাতিক সভাপতি হয়েছেন হায়দরাবাদের শ্রী রাঘব রেড্ডি। সাধারণ সম্পাদক ডাঃ প্রবীণভাই তোগাড়িয়া নতুন কার্যকরী সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। শ্রী তোগাড়িয়ার স্থানে নতুন সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন শ্রী চম্পত রায়। বিদেশ বিভাগের সভাপতি শ্রী অশোক চৌগুলে। বর্তমান সভাপতি শ্রী অশোক সিংহল এবং কার্যকরী সভাপতি শ্রী এস বেদান্তম্ কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতির সদস্য হিসেবে কাজ করবেন। বৈঠকে তিনটি বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে— (১) কম্যুনাল অ্যান্ড টার্গেটেড ভায়োলেন্স বিল, (২) ভারতের বিরুদ্ধে চীনের আগ্রাসী মনোভাব এবং (৩) পশ্চাৎপদ (ও বি সি) হিন্দুদের মধ্যে থেকে মুসলমানদের বিশেষ সুবিধা প্রদানের বিরোধিতা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দক্ষিণবঙ্গের নতুন সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন বর্ধমানের ডাঃ চিন্ময় দত্ত।

আবার বিতর্কের কেন্দ্রে অগ্নিবেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বন্ধু মুক্তি মোর্চার সভাপতি তথা সমাজকর্মী স্বামী অগ্নিবেশের বিরুদ্ধে জাল বিল পেশ করার জন্য দিল্লী সরকার কারণ দর্শানোর (শো'কজ) নোটিশ জারি করেছে। গত ২৯ ডিসেম্বর, ২০১১ দিল্লী সরকারের রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এমন একটি বিলের জন্য এই শো'কজ নোটিশ তাঁকে দিয়েছে। ওই নোটিশে বলা হয়েছে— আপনার পেশ করা বিলটি খতিয়ে দেখতে গিয়ে অনেক অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেক বিলই পেশ করা হয়েছে দিল্লীর বাইরের কোনও স্থানের নাম উল্লেখ করে। যেমন, মধ্যপ্রদেশ। এই বিলগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখে আবার পেশ করুন এবং এই বিলগুলি যে সত্য ও নির্ভুল— এই মর্মে অনুমোদন করুন— বলে নোটিশে জানানো হয়েছে। সম্প্রতি দিল্লীর পাইওনীয়ার 'এক্সক্লুসিভ' হিসেবে খবরটি প্রকাশ করেছে। উল্লেখ্য, অগ্নিবেশ আন্না হাজারের ইন্ডিয়া এগেনস্ট কোরাপসান মুভমেন্ট-এর এক বিচ্ছিন্ন সদস্য।

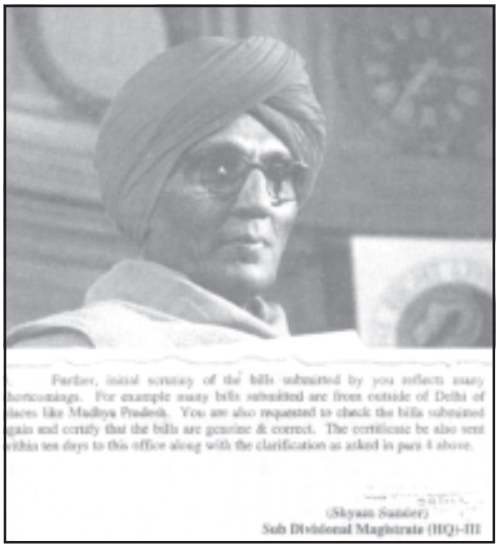

Further, initial scrutiny of the bills submitted by you reflects many shortcomings. For example many bills submitted are from outside of Delhi of places like Madhya Pradesh. You are also requested to check the bills submitted again and certify that the bills are genuine & correct. The certificate be also sent within ten days to this office along with the clarification as asked in para 4 above.

(Shyam Sunder)
Sub Divisional Magistrate (HQ)-III

দিল্লীর রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের সাবডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট (হেডকোয়ার্টার্স) শ্যামসুন্দর এই নোটিশ জারি করে খরচ না হওয়া ২ লক্ষ ২৩ হাজার ৪০৫ কোটি টাকা সরকারকে ফেরত দিতে বলেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০০৫-এ দিল্লীর ৯টি জেলার ক্রীতদাস শ্রমিকদের (বন্ডেড লেবার) নিয়ে সমীক্ষা করার জন্য কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান দপ্তর বন্ধু মুক্তি মোর্চাকে দিল্লী সরকারের মাধ্যমে ১৮ লক্ষ টাকা (চেক নাম্বার ৪১৩৩৫৯, তারিখ ৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৫) দিয়েছিল। কিন্তু ঘটনা হলো, অগ্নিবেশের এন জি ও-র পেশ করা বিলে দেখানো হয়েছে যে ওই টাকার একাংশ মধ্যপ্রদেশের গুণা, রাজস্থানের বারণ জেলাতে গাড়ির তেল খরচের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল যা দিল্লী থেকে বহু দূরে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যে সার্ভে রিপোর্ট অগ্নিবেশের বন্ধু মুক্তি মোর্চার তরফে পেশ করা হয়েছে তাতে দিল্লীর ৯টি জেলার ১৮ হাজার শ্রমিকের উল্লেখ করা হলেও ক্রীতদাস শ্রমিকদের পরিচিতি এবং তাদের নিয়োগকর্তা সম্পর্কে স্পষ্ট কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি। ওই সার্ভের প্রামাণিকতা নিয়ে দিল্লী সরকারের অফিসাররা এখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে বলে জানা গেছে। রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট অগ্নিবেশকে নিজেদের বক্তব্য দশদিনের মধ্যে স্পষ্ট করে জানাতে বলেছে।

আন্না হাজারে গত বছর দিল্লীতে যখন অনশন করছিলেন, তখন একটি ভিডিও ক্লিপিং-কে কেন্দ্র করে স্বামী অগ্নিবেশকে নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয় যদিও তিনি তখন আন্নার টিমের অন্যতম সদস্য ছিলেন। ওই ক্লিপিং-এ দেখানো হয়েছিল তিনি ফোনে 'কপিলজী'কে বলছিলেন— আন্নার টীম 'পাগল ও বিভ্রান্ত হাতী' (ম্যাড অ্যান্ড মিসগাইডেড এলিফেন্টস্)। সন্দেহ করা হচ্ছে, এই কপিলজী হচ্ছেন কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী কপিল সিবাল। পরে নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা এবং আন্নার আন্দোলনকে ভেতর থেকে খতম করছেন বলে যে অভিযোগ ওঠে তা দূর করতে তিনি টিভি সিরিয়াল 'বিগবস' অনুষ্ঠানেও যোগ দিয়েছিলেন। বারবার বিতর্কে জড়িয়ে পড়াতে প্রশ্ন উঠেছে, তিনি কি আদৌ 'স্বামী' পদবাচ্যের যোগ্য?

মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যে মহিলার অবমাননা

নীলাঞ্জনা রায় : কলকাতা॥ মোটর ভেহিকেলস্-এর কর্মীর দ্বারা নিগৃহীত হলেন সঙ্ঘমিত্রা রায়। তাঁর অপরাধ নিজেদের ইনোভা গাড়ীটি আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলায় ব্যবহারের জন্য দিতে অস্বীকার করেছিলেন। গত ৫ জানুয়ারি বেলা ১২টা নাগাদ আলিপুর কমান্ড হাসপাতালের কাছে মোটর ভেহিকেলস্-এর কর্মীরা তাঁর গাড়ী আটক করেন এবং গাড়ীর সব কাগজপত্র দেখতে চান। ড্রাইভার বিধিবদ্ধ সব কাগজপত্র তখনই দেখান। যখন ইনসিওরেন্স ও স্মার্ট কার্ডটি বাজেয়াপ্ত করে ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট-এর দপ্তরে জমা দেবার কথা জানানো হয়, তখন শ্রীমতী রায় গাড়ী থেকে নেমে কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারেন যে গঙ্গাসাগরের জন্য গাড়ীটি ব্যবহার করা হবে।

শ্রীমতী রায়ের স্বামীর একটি অস্ত্রোপচার হবে। সে কারণেই তিনি উডল্যান্ড নার্সিং হোমে যাচ্ছিলেন। এই অনিবার্য প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়ে ভদ্রমহিলা গাড়ীর কাগজ দিতে আপত্তি জানান। প্রসঙ্গত জানানো যেতে পারে নিকটেই একজন পুলিশ সার্জেন্ট দাঁড়িয়েছিলেন। ভদ্রমহিলা বিষয়টি তাঁকেও জানান, কিন্তু তিনিও নিষ্ক্রিয় ছিলেন। শ্রীমতী রায় প্রমাণ হিসেবে বিশিষ্ট শল্যচিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র (Prescription) দেখান। তৎসত্ত্বেও কর্মরত ব্যক্তিটি গাড়ীটি নেবার জন্য ক্রমান্বয়ে জোরজলুম করতে থাকেন এবং অপমানজনক আচরণ করে যেতে থাকেন। ড্রাইভারের লাইসেন্স নম্বর বাতিল করে দেবার হুমকিও দেওয়া হয়। শ্রীমতী রায় উপায়ন্তর না দেখে নিজে গাড়ীতে বসে থেকে জেলা শাসকের দপ্তরে যেতে চাওয়াতে অবশেষে অব্যাহতি পান। বাদানুবাদে দীর্ঘ সময় নষ্ট হওয়াতে যে চিকিৎসাবিষয়ক কাজে তিনি যাচ্ছিলেন, সেটি পণ্ড হয়।

প্রশ্ন হলো— গঙ্গাসাগর মেলা ও স্নান উপলক্ষে বিশাল জনসমাবেশ যেখানে হয়, সেখানে হয়ত কিছু সরকারি বাসের প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক সরকারী গাড়ী থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত ব্যবহারের আধুনিক গাড়ীর (ইনোভা) কি প্রয়োজন আছে সেটি ঠিক বোধগম্য হয় না। তাহলে কি সরকারি আমলা বা তাঁদের স্বজন-বান্ধবকে নিয়ে যাবার জন্য জনসাধারণের গাড়ী ব্যবহারের যে প্রচলন বা প্রবণতার কথা শোনা যায় তা সত্যি? তবে কি 'মা-মাটি- মানুষের' পশ্চিমবঙ্গে কি 'পরিবর্তন' অধরাই থাকল?

মুখ্যমন্ত্রী'র মতো 'স্বচ্ছ রাজনীতিক' খুঁজে পাওয়া যাবে না?

নিশাকর সোম

এ পর্যন্ত রাজ্য-রাজনীতির আলোচনায় এই কলামে কখনও তৃণমূলকে একতরফা সমালোচনা করা হয়নি। কিন্তু এখন যা ঘটছে তাতে আর সমালোচনা না করে থাকতে পারা যাচ্ছে না। প্রথমেই যে ঘটনা সাধারণকে আলোড়িত করছে তা হলো রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ অধ্যক্ষকে তৃণমূলীদের আক্রমণ। এই আক্রমণ সম্পর্কে তৃণমূলীদের যুক্তি হলো, 'অধ্যক্ষ সিপিএমের লোক।' এ সম্পর্কে পরিবর্তনের অন্যতম কাণ্ডারী সুনন্দ সান্যাল বলেছেন, ''শুনলাম, রায়গঞ্জের মূল হোতা সাফাই দিয়েছে, কলেজের অধ্যক্ষ সিপিএমের লোক। কোনও ব্যক্তির সিপিএম সমর্থক হওয়ার ১০০ শতাংশ অধিকার আছে। তার জন্য তাঁকে মারধর করতে হবে?'' তৃণমূল কংগ্রেসের এই কর্মীদের অশালীন আচরণকে মাওবাদীদের সঙ্গে তুলনা করে সুনন্দবাবু বলেন, ''জঙ্গলে যা চলছে, সভ্য সমাজেও তারই পুনরাবৃত্তি ঘটছে, গোটা ঘটনা সংবিধানের অবমাননা।'' এই অধ্যক্ষকে পেটানোর যুক্তি হচ্ছে সিপিএমের লোক! অর্থাৎ বিরোধীদের পেটানো যাবে। এতো পরাজিত মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কথারই পুনারাবৃত্তি! বুদ্ধবাবু বলেছিলেন, ''বিরোধীদের মাথা ভেঙে দেব।'' এই ঘটনা সম্পর্কে পরিবর্তনকামী নাট্যব্যক্তিত্ব কৌশিক সেন বলেছেন, ''মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা এবং জনসমর্থনকে ঢাল করে অরাজকতা করার সংস্কৃতি অনেকদিন আগেই চালু হয়ে গিয়েছে। যাদবপুরে এরকম ঘটনা দেখেছি।'' কৌশিকবাবু বলেন, ''এক শ্রেণীর বিশিষ্ট মানুষ বলছেন, আগে ৫০টি এরকম ঘটনা ঘটতো, এখন ২০টা হচ্ছে। কিছু মানুষ হঠাৎ ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে যা খুশি তাই করছে।'' এ ঘটনা সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর বক্তব্য— 'ছোট ঘটনা'।

এ ঘটনা প্রমাণ করছে তৃণমূল সিপিএমের পূর্বতন নীতিই অনুসারী হয়েছে। তৃণমূলের নিচের তলার কর্মীরা উৎসাহ পাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী তথা নেত্রীর কথাতে। তিনি সিপিএমের উদ্দেশে বলেছেন, 'তোমরা ৩৪ বছর কিছু করনি— তোমরা চুপ করে থাকবে।' অর্থাৎ বিরোধী মত থাকবে না।

শুধু সিপিএম নয়, জোটসঙ্গী কংগ্রেস সম্পর্কে মমতাদেবীর বক্তব্য হলো--- 'কংগ্রেস-সিপিএম একই কথা বলছে। কংগ্রেস সিপিএমের দালাল।' তৃণমূলী বিভিন্ন নেতা-মন্ত্রীর বক্তব্য হলো— 'কংগ্রেস মন্ত্রীরা পদত্যাগ করে, মমতার ছবি ছাড়া নির্বাচনে দাঁড়ালে জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে,' 'কংগ্রেস-এ সমাজবিরোধীরা ঢুকছে।' মুর্শিদাবাদের সাংসদ তথা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি অধীর চৌধুরীকে ক্রিমিন্যাল বলা হয়েছে। প্রিয়রঞ্জন-জায়া দীপা দাশমুন্সি-কে রায়গঞ্জের ঘটনায় দোষ চাপানো হয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানে মতামত প্রকাশ এবং সংগঠন করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই সরকার ইউনিয়ন নির্বাচনে ছাত্রদের অংশগ্রহণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করছে। শিক্ষকদের রাজনীতি করার অধিকার থাকছে না। পুলিশ সংগঠন নিষিদ্ধ করা হচ্ছে, সংগঠনের স্বীকৃতি খারিজ করা হয়েছে। পুলিশদের সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন— 'আমার নিজস্ব নেটওয়ার্কে খবর পাচ্ছি কিছু পুলিশ- কর্মচারি সিপিএমের ভজনা করছে।' মুখ্যমন্ত্রীর এই কথায় পুলিশ বাহিনীর মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে তৃণমূলকর্মীরা অপরাধ করলে পুলিশ তাঁদের ধরবে না। উদাহরণ-রায়গঞ্জের ঘটনা। সেখানে তৃণমূলী অভিযুক্তদের ধরা হলো না। শ্রমমন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু বলেছেন, 'শ্রমিক সরাসরি আমার কাছে কথা বলুক, ইউনিয়নের দরকার নেই।'

রাস্তার হকাররা বলছেন--- 'আমাদের রোজগার বন্ধ হলে কি খাবো?' মুখ্যমন্ত্রী গাড়িতে উঠতে উঠতে বলছেন—'চুরি করো।' তিনি আরও বলেছেন, 'হকার আন্দোলনের নেতারা রাস্তায় বসতে দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা কামাই করছে।' হকার-নেতা শক্তিমান ঘোষ এ কথার প্রতিবাদ করেছেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন শক্তিমান ঘোষ বিগত বিধানসভা নির্বাচনে 'পরিবর্তনকামী' ছিলেন। তাঁদের সংগঠন বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছিলেন। এটা কি তারই ফল?

অপরদিকে যত্রতত্র আর্থিক সহায়তা বা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করে সরকারি ব্যয়কে বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে। ফলে উন্নয়ন খাতে ২৫ শতাংশ ব্যয় ছাঁটাই হয়েছে। ভর্তুকি-ঋণদান-এ শর্ত চাপানো হয়েছে। সিপিএমের মতো সুর তোলা হয়েছে— কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না। কেন্দ্রকে হুমকি দিয়ে বলা হয়েছে কংগ্রেসের সমর্থন ছাড়াই রাজ্যমন্ত্রিসভা থাকবে। ইউপিএ-২ সরকারের প্রাণভোমরা হলো তৃণমূল— এ কথাটা বারে বারে বলা হচ্ছে।

ইন্দিরা আবাসনের নাম পরিবর্তনের সমর্থনে নজরুল ইসলামের নাতনিকে আনা হয়েছে। গনিখানের এক আত্মীয়াকে তৃণমূলে এনে কংগ্রেস-কর্মীদের তৃণমূলে চলে আসার ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি 'প্রমোশন' পাওয়া মন্ত্রী, যিনি পূর্বে 'তরমুজ' বলে অভিহিত ছিলেন, তিনি এখন তৃণমূলের অন্যতম মুখপাত্র হয়েছেন। ধন্য সুব্রতবাবু! সিপিএম-পন্থী দৈনিকে তিনি একদা লিখেছিলেন— 'জ্যোতিবাবু আমার রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও পিতৃসম।'

এখন আর মাওবাদীদের সম্পর্কে তেমন কোনও উচ্চবাচ্য করছেন না মুখ্যমন্ত্রী। বাজারে গুজব— সুচিত্রা মাহাতো কিষেণজি-এর মৃত্যুর দিনেই গ্রেপ্তার হয়ে পুলিশ হেপাজতে আছে। আরও গুজব— মাওবাদী নেতা আকাশও নাকি আত্মসমর্পণের জন্য উন্মুখ।

নতুন সরকারকে নিশ্চয়ই আরও সময় দিতে হবে। কিন্তু কি দেখা যাচ্ছে— কোনও মন্ত্রীর নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার আছে কি? সম্প্রতি পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী-আমলাদের সভায় মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তিনি পর্যটনমন্ত্রী রচপাল সিং-এর কাজের গতি না থাকার সমালোচনা করলেন। পর্যটন সচিব তাঁর দপ্তরের কর্মতালিকা মুখ্যমন্ত্রীর নিকট দিলে সেই কাগজটা গোল করে মুড়ে পর্যটন সচিবের গায়ে ছুঁড়ে দিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর এমত আচরণ কি পদমর্যাদা বৃদ্ধি করে? মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলে চলেছেন— 'আমার মতো স্বচ্ছ রাজনীতিক খুঁজলেও পাওয়া যাবে না।' একথার অর্থ কি তাঁর দলের রাজনীতিকরা অস্বচ্ছ? নাকি সোনিয়া গান্ধী স্বচ্ছ নন? না ডঃ মনমোহন সিং স্বচ্ছ নন? ডঃ মনমোহন সিং-এর কাজের সমালোচনা করলেও বিজেপি নেতা আদবানি তাঁকে কিন্তু 'সৎ' বলেছেন!

লোকপাল প্রহসন

তারক সাহা

লোকপালের সংশয় তৈরি হয়েছিল ২৭ ডিসেম্বরেই। আন্না টিম ধূমধাম করে মুম্বাইয়ের ময়দানে যে তিন দিনের অনশনের ডাক দিয়েছিল তাতে অক্সিজেন জোগায়নি আমজনতা। লক্ষাধিক মানুষের জমায়েত হবে বলে আশা করেছিল টিম আন্না। কিন্তু মাত্র ৪-৫ হাজার মানুষের ভীড় অনেকটাই স্তিমিত করে দেয় টিম আন্নার স্পিরিটকে। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন আন্না হাজারে। অনশন প্রত্যাহার করা হয়।

আর টিম আন্নার এই পশ্চাৎ-অপসারণ কংগ্রেসের ধমনীতে রক্ত জোগায়। ২৭ তারিখে সংসদ বসে বড়দিনের ছুটির পর। অনেক টালবাহানার মধ্যে লোকপাল বিল পেশ হয় বটে, কিন্তু বিরোধীদের আনা সমস্ত সংশোধনী খারিজ হয়ে যায়। সরকার ও তার সঙ্গীরা মিলে লোকসভায় তো বিল পাশ করে দিল, কিন্তু লোকপালের আসল প্রহসন শুরু হয় এর পর।

আন্নার অনশন প্রত্যাহারে শাপে বর হয়েছে কংগ্রেসের। পরবর্তী নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে সংসদের অন্য কক্ষে--- রাজ্যসভায়। লোকসভায় তো সংশোধনী ছাড়াই তৃণমূলের সুদীপ-কল্যাণরা বিলের স্বপক্ষে জোরদার সওয়াল করে ভোট দিয়ে দিল। নাটকের সূত্রপাত এখানেই। কলকাতায় বসে দলের সর্বময় নেত্রী টিভি-তে নিজের দলের সাংসদদের কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ। শোনা যাচ্ছে, নেত্রী তাঁর নেতাদের ভোট না দেওয়ার পক্ষে ফোন করেছিলেন সুদীপ-কল্যাণদের। যোগাযোগ হয়নি। সুতরাং ভোট পড়ে গেল। এইসব ব্যাপার-স্যাপার দেখে অনেকেই বিস্মিত। কারণ লোকপাল বিল বহু চর্চিত। লোকসভায় বিল পেশের আগে কেন দিদি নেতাদের কিছু বললেন না? তবে কি বিষয়টা ওয়েল অর্কেস্ট্রেড কংগ্রেসী গেমপ্ল্যান?

রাজ্যসভায় দেখুন বিলটা পেশ হলো আন্নার মুম্বাই সম্মেলন মাঠে মারা যাওয়ার পরই। কংগ্রেস দেখল মুম্বাই সম্মেলন দিল্লির মতো উত্তাপ ছড়াতে পারেনি আন্নাজীর হোম স্টেটে।

সময়টা লক্ষ্য করুন। ২৮ তারিখে টিম আন্নার ধর্ণা শেষ। আর ২৯ তারিখ রাজ্যসভায় বিল নিয়ে ভোটাভুটি। লোকসভায় তৃণমূল বিলের সমর্থক, রাজ্যসভায় বিরোধী। নেত্রী দাবী তুললেন লোকায়ুক্ত নিয়ে কেন্দ্রের খবরদারী চলবে না। রাজ্যের অধিকারে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ নৈব নৈব চ। কারণ তৃণমূল বেঁকে বসেছে। সংখ্যা নেই। ২৪৩ জনের মধ্যে কংগ্রেসের মাত্র ১০৪ জন। প্রণববাবু, কপিল সিব্বালের মতো কুশীলবরা যুদ্ধে এক পা এগিয়ে শত পা পিছোলেন। অতএব লোকপাল আপাতত ঠাণ্ডা ঘরে। বিজয়ী কে? গণতন্ত্র, না নেত্রীতন্ত্র?

আর যে কেউ জয়ী হোক, গণতন্ত্র নয়। রামলীলা, যন্তর মন্তরে ব্যাপক সাফল্যে হতচকিত ভারতীয় রাজনীতি মহল। কংগ্রেস আর তার সাঙ্গপাঙ্গ ছাড়া আন্নার ধর্ণামঞ্চে সামিল দেশের রাজনৈতিক বর্ণালীর তাবড় কুশীলবরা। তাঁরা কবুল করলেন— তুমি আগে বড়হ্ হাম আন্না তুমহারা সাথ হ্যায়'। কিন্তু সত্যিই কি এঁরা আন্নার সঙ্গে? সংশয় আছে। যে সব খবর আসছে তাতে দেখা যাচ্ছে দলমত নির্বিশেষে কোনও সাংসদই ব্যক্তিগতভাবে আন্নার সমর্থক নয়। ঠেলায় পড়ে এঁরা বাপ বলছেন। এঁদেরকে রাজনীতি করতে হয়। দল রাখতে গেলে দলে দু-চারজন কালমাডি, এ রাজা থাকবেন না এমন নয়। সুতরাং লোকপাল, লোকায়ুক্ত পাস হয়ে গেলে আজ যারা বিরোধী তাদেরও এই সমস্যা সামলাতে হবে। আজ কংগ্রেস কমজোরি বলে ইউ পি এ-র ওপর খড়্গহস্ত এন ডি এ।

সময় কারুর জন্য বসে থাকে না। ২০১৪-তে কে বলতে পারে কংগ্রেস বিরোধী আসনে বসবে না! তখন তো কংগ্রেস খাস্তা হাল করে ছাড়বে সরকার পক্ষকে এখন যেমন করছে বিরোধীরা। কাজেই কোনও পক্ষই মুখে বললেও আন্তরিকভাবে আন্নার সমর্থক অন্তত রাজনীতিবিদরা নন।

লোকায়ুক্ত নিয়ে হাতে গরম উদাহরণ রয়েছে রাজনেতাদের সামনে। লোকায়ুক্ত বিচারে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ইয়েরাদুপ্পাকে গদি ছাড়তে হয়েছে। এমনকী জেলযাত্রা হয়েছে তাঁর। কাজেই লোকপাল, লোকায়ুক্ত কোনটাই আপামর রাজনেতারা চাইবে না। সাধারণ মানুষ আজ সমাজের সর্বস্তরে জেরবার। শোনা যায় মায়ের ডেথ সার্টিফিকেট আনতে গিয়ে পুত্রকে হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। এতটাই নীচে নেমেছে আমাদের সমাজ। দৈনন্দিন কাজকর্মে ঘুষের কড়ি গুনতে হয় যে সব মানুষদের তারাই আজ জড়ো হয়েছে আন্নার পিছনে।

তাহলে লোকপালের ভবিষ্যৎ কী? আগামী ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি বাজেট অধিবেশন শুরু। এর মধ্যে ৫টা রাজ্যে নির্বাচন। লিটমাস টেস্ট প্রতিটি রাজনৈতিক দলের। জাতীয় রাজনীতি নয়, ইতিহাসের ছোট ছোট জায়গিরদারের মতো সমাজে অবস্থান প্রাদেশিক দলগুলির। সুতরাং এইসব দলগুলি নিজের স্বার্থে 'শাইলক' হয়ে ওঠে। মমতা বরাবরই চেনা হয়েও অচেনা। কোনও জোট-ই মমতাকে নিয়ে খুশি নয়। বাধ্যবাধকতার জন্য এন ডি এ সঙ্গে নিয়েছিল মমতাকে, এবার মমতা ইউ পি এ শিবিরে। গুঞ্জন পাঁচ রাজ্যে ভাল ফল করতে পারলেই মমতার গুরুত্ব খাটো করে দেবে কংগ্রেস। অবশ্য এ সবই ভবিষ্যতের কথা। আগামীদিনে যদি টিম আন্না তার আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি এগিয়ে নিয়ে যেতে সফল না হয় তাহলে লোকপাল হিমশীতল অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে দিনের আলো দেখতে পাবে কি না তা নিয়ে আম-আদমি যথেষ্ট সংশয়ে। এদিকে মুম্বাইয়ে আন্নাজী শুনিয়ে রেখেছেন যে, পাঁচ রাজ্যে কংগ্রেস বিরোধিতায় নামবে তাঁর টিম। কংগ্রেস ও তার সঙ্গীরা যদি ভালো ফল না করে আগামী নির্বাচনে তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে আন্নার আন্দোলন জনমানসে ভাল নাড়া দিতে পেরেছে। তখন কিন্তু শঙ্কিত কংগ্রেস তেড়েফুঁড়ে লোকপাল বিল পেশের চেষ্টা করবে।

উল্টোটা হলে উৎসাহী কংগ্রেস বিলটাকে ঠাণ্ডা ঘর থেকে বের করে আনবে কিনা সন্দেহ রয়েছে। দুর্নীতিমুক্ত সমাজ, দেশ গড়ার স্বপ্ন আন্না হাজারে যা দেখছেন এবং তাঁর দ্বিতীয় গান্ধী হবার বাসনায় জল পড়বে। মানুষ হতাশ হবে দুর্নীতিপ্রবণ রাজনেতাদের নিয়ে।

সবটাই সম্ভাবনায় ঘেরা। ২০১২ তাই দুর্নীতিমুক্ত এক সমাজ দেশ গড়তে পারে কিনা এজন্য আন্না হাজারের দিকে মুখিয়ে রয়েছে সারা ভারতের আম-আদমি।

(অনিবার্য কারণবশতঃ এবার গূঢ়পুরুষের কলম প্রকাশিত হলো না)

তোগাড়িয়ার অভিযোগ

পশ্চাৎপদ হিন্দুদের বঞ্চিত করে তাদের প্রাপ্য কোটা থেকে কেটে সাড়ে চার শতাংশ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণ করার তীব্র বিরোধিতা করলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকরী সভাপতি ডাঃ প্রবীণভাই তোগাড়িয়া। সম্প্রতি কানপুরে এক ছাত্র সম্মেলনে বক্তব্য রাখার পর তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রাহুল গান্ধী মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে তিনি অভিযোগ করে বলেন, ও বি সি-দের বঞ্চিত করেই ২৭ শতাংশ থেকে সাড়ে চার শতাংশ মুসলমানদের জন্য দেওয়া হচ্ছে। শ্রী তোগাড়িয়া আরও বলেন, এর ফলে গরীব হিন্দুদের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। মুসলমান ও ধর্মান্তরিত খৃস্টানদের জন্য সংরক্ষণ কোটা ফেরত না নিলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আন্দোলনে নামবে। একই সঙ্গে পরিষদ আদালতে যাবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। ওয়াকিবহাল মহলের মতে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখেই ইউ পি এ সরকার এই নীতি নিয়েছে।

অনলাইন সংস্কৃত অনুবাদ

সংস্কৃত থেকে হিন্দির অনলাইন অনুবাদের কারিগরী উন্নয়নের জন্য ভারতের সাতটি নামী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হাত মেলাল। ওই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে রয়েছে হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দরাবাদ আই আই টি, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দরাবাদ সংস্কৃত আকাদেমী, ব্যাঙ্গালোর পূর্ণ প্রজ্ঞা বিদ্যাপীঠ, তিরুপতি বিদ্যাপীঠ এবং জয়পুর জগৎগুরু রামানানন্দচার্য রাজস্থান সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়। গত ৫ জানুয়ারি দিল্লীতে ১৫তম বিশ্ব সংস্কৃত সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। সেখানেই এই প্রকল্প ঘোষণা করা হয়।

টাকা তৈরির খরচ

প্রতি হাজার টাকার নোট ছাপাতে খরচ হচ্ছে ৩টা ১৭ পয়সা। একইভাবে প্রতি ৫০০ টাকার নোট ছাপাতে ২ টাকা ৬৪ পয়সা, প্রতি ১০০ টাকার

নোট ছাপাতে ১ টাকা ৪৪ পয়সা, প্রতি ৫০ টাকার নোট ছাপাতে ১ টাকা ২৩ পয়সা, প্রতি ২০ টাকার নোট ছাপাতে ৯৫ পয়সা, প্রতি ১০ টাকার নোট ছাপাতে ৭৫ পয়সা, প্রতি ৫ টাকার নোট ছাপাতে ৪৮ পয়সা খরচ হচ্ছে। যদিও আসল মূল্যের ওপর উৎপাদন খরচের শতাংশের হিসেবে ৫ টাকার নোটে উৎপাদন খরচ সবচেয়ে বেশি, ৯.৬ শতাংশ আর সবচেয়ে কম ১০০০ টাকার নোটে, ০.৩ শতাংশ। ৫০০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০ টাকা, ২০ টাকা, ১০ টাকার নোটে আসল মূল্যের ওপর উৎপাদন খরচের হার যথাক্রমে ০.৫, ১.৪, ২.৫, ৪.৭, ৭.৫ শতাংশ। বাব্বা! টাকা তৈরিতেও এত খরচ!

ছত্তিশগড়ে জেলা-সংখ্যা বৃদ্ধি

নকশাল মোকাবিলায় আরও এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল ছত্তিশগড় সরকার। প্রশাসনিক সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে গঠিত হলো নতুন ৯টি জেলা। রাজ্যে জেলার সংখ্যা বেড়ে হলো ২৭। মূলত অতি গুরুত্বপূর্ণ মাওবাদী অধ্যুষিত জেলাগুলিকে প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে একাধিক ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন— বাস্তার জেলাকে ভেঙে কোন্দাগাঁও, দান্তেওয়াড়াকে ভেঙে সুকমা, সুরগুজা জেলাকে ভেঙে সুরজপুর ও বলরামপুর, রায়পুরকে ভেঙে বালোদা বাজার ও গড়িয়াবান্ড, দুর্গকে ভেঙে বিমিত্রা ও বালোদ এবং বিলাসপুরকে ভেঙে মুঙ্গেলি নামে ওই নতুন ৯টি জেলা তৈরি হয়েছে। সরকারি সূত্রের খবর, নকশাল মোকাবিলায় সুকমা এবং কোন্দাগাঁও জেলার প্রতি বিশেষ প্রশাসনিক নজর দেওয়া হচ্ছে।

পরলোকে প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডু

বিশিষ্ট লেখক প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডুর জীবনাবসান হয়েছে। গত ৩০ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় মধ্যমগ্রামে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার দেওভোগ গ্রামে ১১ শ্রাবণ, ১৩৩১ বঙ্গাব্দে তাঁর জন্ম। পিতা যোগেন্দ্রলাল কুণ্ডু ও মাতা শ্যামলরাণী দেবী। ছাত্রাবস্থায় 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'-এর নেতা জ্যোতিশচন্দ্র জোয়ারদারের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁরই প্রেরণায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেকে যুক্ত করেন। এর ফলে তিনি বৃটিশ রাজশক্তির কোপে পড়েন এবং তিন বছর (১৯৪৩-১৯৪৫) কারাজীবন ভোগ করতে হয়। পরবর্তীকালে জীবনবীমা-র উন্নয়ন আধিকারিক (ডি.ও.) হিসাবে কাজ করে অবসর গ্রহণ করেন এবং গ্রন্থ রচনার কাজে মনোনিবেশ করেন। তাঁর এক পুত্র ও তিন কন্যা সকলেই প্রতিষ্ঠিত।

স্বাধীনোত্তর যুগে দেশীয় শাসকগোষ্ঠীর ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে নিজের বলিষ্ঠ লেখনীতে অত্যন্ত সাবলীল ও যুক্তিসঙ্গতভাবে ব্যবহার করে একের পর এক পুস্তক রচনা করেন। তাঁর রচিত বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'যে মহাত্মা সারা জীবন দ্বিচারিতা করে গেছেন', 'স্বাধীনতা সৈনিকের ডায়েরী', 'হিন্দুর শত্রু হিন্দু', 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'বিদায় নেবার আগে' এবং সংকলিত গ্রন্থ 'Netaji Vs. Gandhiji'। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার তিনি অত্যন্ত শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। তাঁর প্রয়াণে স্বস্তিকা পরিবার গভীর শোকাহত।

বাংলা খুঁজছে নতুন কাণ্ডারী

শ্যামল কুমার হাতি

আমাদের রাজ্যে সরকার বদলেছে প্রায় ৭ মাস হয়ে গেল, নতুন সরকার আসার পর বাংলার মানুষ অনেক কিছু দেখলও। সরকার বদল হওয়ার পর রাজ্যের অধিকাংশ স্কুলের পরিচালন সমিতির নির্বাচনে তৃণমূলীরা জয়লাভ করেছে। অনেক স্কুলে তারা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছে। যেখানে নির্বাচন হয়েছে তাতে খুব খারাপ হলেও পরাজিত দল ৩৫—৪০ শতাংশ ভোট অন্তত পেয়েছে।

সুশান্ত ঘোষের মতো এক সময়ের ডাকসাইটে নেতা আজ জেলে পচছে। মুখ্যমন্ত্রী চেয়ারে বসেই কয়েকটি হাসপাতালে হঠাৎ হাজির হয়ে হাসপাতালের সুপার সমেত সমস্ত কর্মীদের চমকে দিয়েছেন। এক অবাধ্য সুপারকে সাসপেন্ডও করেছেন। সাধারণ মানুষ তো তখন দু'হাত তুলে মুখ্যমন্ত্রীর কাজকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। গরীব মানুষের মনে আশা জেগেছিল এবার হয়তো আর বিনা চিকিৎসায় মরতে হবে না।

এরপর একে একে রাজ্যে বিপর্যয় নেমে এসেছে। প্রথমে সেবকের ব্রিজ ভেঙে পড়া, পরে ভূমিকম্প, হাসপাতালে শিশুমৃত্যু, আমরি হাসপাতালে আগুন, পরিশেষে বিষমদে প্রায় দুশো মানুষের মৃত্যু। কিষেণজীর মৃত্যু, চাষীর আত্মহত্যা সবকিছুর খবরই খুবই অল্প সময়ের মধ্যে সংবাদের শিরোনামে এসেছে। কোনও কোনও স্থানে আমরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকেও খুব দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছোতে দেখেছি। আবার কোনও কোনও স্থানে তাঁর অনুপস্থিতিও চোখে পড়েছে।

এরই মাঝে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের রাজ্যের জন্য বিশেষ প্যাকেজ চেয়েছেন। আবার না পেয়ে গোঁসাও করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কথা দিয়েও 'বিশেষ প্যাকেজ' না দেওয়ায় তিনি দেখে নেওয়ার হুমকিও দিয়েছেন। পরে বাধ্য হয়ে খরচ কমাবার কথা তিনি মন্ত্রিসভার বৈঠকে বলেছেন। তাঁর সহকর্মীরা এটা কতটা শুনেছেন তা রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ জানেন। কোথাও কেউ খরচ কমানোর রাস্তায় হাঁটছে না, এখন তো ওঁদের নেতা-মন্ত্রীদের আচরণ দেখলে মনে হয় এখন অনেকেই পয়সা বানানোর কাজে ব্যস্ত। তাই পাড়ায় পাড়ায় যারা লাল পতাকা নিয়ে মানুষকে চমকাতো তারা আজ ঘাসফুল মার্কা পতাকা হাতে তুলে নিয়েছে। মানুষ বোকা নয়। মানুষ সব কিছু দেখছে। যেমন নির্ভয়ে ভোট করানোর ফলে নিঃশব্দে চৌত্রিশ বছরের জগদ্দল পাথরের সরকারকে তুলে ফেলে দিয়েছে। সেই মানুষ সব দেখছে। মন্ত্রী কি করছে, এম এল এ, এম পিরা কি করছে, পঞ্চায়েতের বাবুরা কি করছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানরা কি করছে, কে কে তাদের গাড়ীতে ঘুরছে সব কিছুই মানুষ দেখছে। প্রথম প্রথম একটু হালকা নজরে দেখছে পরে তারাই ঠিক বিচার করবে। বিপদ আছে তৃণমূল দলের মধ্যেই।

সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় যখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন রাজ্যের সমস্ত জেলেই কংগ্রেসীরা ছিল, ওদের গ্রুপে গ্রুপে লড়াই-এর জন্য। রাজ্যে আজ সেই অবস্থা দেখা দিয়েছে। শহরে, গ্রামে সর্বত্র আদি তৃণমূল আর নব তৃণমূলের লড়াই। অধিকাংশস্থানেই আদি তৃণমূলের লোকেরা কোণঠাসা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, হুগলী, মালদা, বর্ধমান, নদীয়া সবজায়গাতেই একই খবর। দলের নেত্রী নতুন সদস্য নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। এখন ব্যাকডেটে সদস্য নেওয়া চলছে। আসলে পাড়ায় পাড়ায় বিভিন্ন নেতা ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য, যারা আগে মানুষকে মেরেছে তাদেরকেই দলে নিচ্ছে। আর তাতেই চটেছে গ্রামের সাধারণ লোক। তারা পুরানো তৃণমূলের লোকেদের নালিশ করছে। এতেই গণ্ডগোল, এখন তো রাজ্যের মন্ত্রীদের দিকেও আঙুল উঠছে।

ইতিমধ্যে ডানলপ সমেত কয়েকটি জুট মিল বন্ধ হয়েছে। নতুন শিল্প তো কিছুই হলো না। উল্টে বন্ধ হয়েছে। শ্রমিকের আশার কিছুই নেই। কতদিন এভাবে চলবে? কখনও জঙ্গলমহলে গিয়ে আশার বাণী কখনও সংখ্যালঘুদের মাঝে গিয়ে আশার বাণী, আসলে কাজের কাজ কবে হবে? ইতিমধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর মুখ্যমন্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছেন খরচ কমাবার জন্য। আয় বাড়াবার জন্যও বলেছেন। না হলে সরকারের বিপদ একথাও বলেছেন।

প্রশ্ন হলো, এই সরকার আয় বাড়াবে কীভাবে? আর খরচ কমাবেই বা কীভাবে? রাজ্যটাকে বর্তমান সরকার চেনে রাজনৈতিক ভাবে। কোথায় কত তাদের সমর্থক আছে তার হিসাব রাখে। কোথায় কীভাবে ভোট বাড়ানো যাবে সর্বদা তার অঙ্ক পূর্বসূরীদের মতো এই সরকারের দলের লোকেরা করে চলেছেন। এই ভোট সর্বস্ব রাজনীতির জন্যই আমাদের রাজ্য আজ ক্রমেই পিছনের দিকে দ্রুত চলেছে। কেন আমাদের এত খরচ? চাপটা কোথায় তা কবে খোঁজা হবে? আমরা যারা সংসার চালাই তারা জানি বাড়িতে অতিথি এলে আমাদের সংসারে কতটা চাপ পড়ে। আর অতিথি যদি মাসের পর মাস, বছরের পর বছর থেকে যান তা হলে আমাদের তো ভাঁড়ে

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যেমন বর্তমান বাংলাকে পাকিস্তানে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন, এই বাংলাকে ভারতের সঙ্গে রাখতে পেরেছিলেন; পারবেন না তাঁর মন্ত্রশিষ্যরা এই বাংলাকে রক্ষা করতে? গ্রামবাংলার অর্থনীতিকে রক্ষা করতে? বাংলার যুবকের রোজগার যাতে অন্য রাজ্যের নাগরিকরা অন্যায়ভাবে ভোগ না করে তার ব্যবস্থা নিতে? যদি পারে এবং মানুষ যদি বিশ্বাস করে তবে এবার তাদের হাতেই তুলে দেবে বাংলার ভবিষ্যত। জাগ্রত জনতা তারই প্রহর গুনছে।

মা ভবানী হবার অবস্থা হবে। এই রাজ্যটারও তাই হয়েছে। বছরের পর বছর প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নাগরিকরা আমাদের রাজ্যে অন্যায় ভাবে অনুপ্রবেশ করে এখানে পাকাপাকিভাবে বসে পড়েছেন। একাজে তাদের সাহায্য কংগ্রেস, তৃণমূল এবং সিপিএম করেছে। তারা দ্রুত রেশনকার্ড পেয়েছে। তাইতো সীমান্তবর্তী জেলার হঠাৎ এত জনবসতির ঘনত্ব বেড়েছে। কেউ তার দিকে নজর দিচ্ছে না। এরা আমাদের অন্ন ধ্বংস করছে, আমাদের রোজগারে ভাগ বসাচ্ছে, আর আমরা 'কালিদাস' হয়ে বসে আছি। এভাবে ডালে বসে ডাল কাটলে তো একদিন পড়ে মৃত্যু হবে। আমরা বর্তমান নিয়ে মত্ত। ভবিষ্যত নিয়ে ভাবতে চাই না। ভবিষ্যত ভাবার সময় তো নেই। তাই যারা সত্যের খোঁজ খবর রাখে তাদের সবাই মিলে আক্রমণ করে। সংবাদপত্রগুলি কখনওই এই সব খবর নিয়ে লেখালেখি করবে না। এসব লিখলে তাদের পেট্রোডলার দেওয়া মালিকরা রুষ্ট হবে। তাই সব জেনে সব মহলই চুপ। যত অনুপ্রবেশ ঘটবে ততই বিষমদের প্রভাব বাড়বে। নেশার নানান সামগ্রী আমাদের ছাত্র যুবদের মত্ত করে রাখবে। সাবধানী মায়েরা নিজের সন্তানকে আঁচলে বেঁধে রাখবে। কিন্তু বাকিরা? তাদের সন্তানরা আস্তে আস্তে এলিয়ে যাবে অন্ধকার জগতে। আজ তো খোঁড়া বাদশা, জাহাঙ্গীরদের নাম শুনছি, শুনছি সেলিম বাহিনীতে একসময় মজিদ মাস্টার ছিল। এদের যারা মদত দিয়েছে তারা সুশান্ত, তড়িৎ অথবা লক্ষ্মণরা। অতীতে বাংলাকে জগৎ শেঠ, মিরজাফররা ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়েছিল। আজও বাংলাকে এই সমস্ত নামধারী লোকেরা অধঃপতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। পরিবর্তন হলো সরকারের। পরিবর্তন হলো দলের। সেলিম বাহিনী , বাদশা, সম্রাটরা তাদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব বদল করল। বাংলার মানুষ কি এই পরিবর্তন চেয়েছিল!

বাংলার মানুষ চায় শান্তি, মানুষ চায় উন্নয়ন। বাংলার মানুষ চায় বাংলা তার অতীত গৌরব ফিরে পাক। আজ যারা সরকার চালাচ্ছে তারা তো পাড়ায় পাড়ায় শক্তি আরাধনায় অভ্যস্ত। এত ভাবার সময় তো ওদের নেই। আর ওদের নেত্রী তিনি তো সব বিষয়ে পণ্ডিত। তার তো আর জানার কিছুই বাকি নেই। মনে রাখতে হবে যে বাংলার জনতা বুদ্ধ-বিমানদের আস্তাকুঁড়ে ফেলেছে। সেই জনতা চিরকাল কাউকে মাথায় তুলে নাচবে না, ইতিমধ্যে দু-একজন 'পরিবর্তনকামী' বুদ্ধিজীবী শিল্পী মুখ খুলেছেন, কাল যদি তাঁরা অন্যদের নিয়ে পথে নামেন। তখন কি হবে? সরকারের রাজনৈতিক গ্রাফের দ্রুত পতন হবে। এই সব ইফ্‌স এন্ড বাটস্‌ করতে করতে আবার একটা নির্বাচন আসবে।

এবার কার পালা? তৃণমূল যতই মানুষের চাহিদা মতো কাজ নাই করুক বাংলার মানুষ কিন্তু আগামী নির্বাচনে কিছুতেই সিপিএম-কে একটুও জমি দেবে না। এরমধ্যে সুশান্ত ঘোষের মতো নেতাদের বিচার অনেকটা এগিয়ে যাবে। ক্রমেই মানুষ সত্যের সন্ধান পাবে। এক সত্যের সন্ধান পেলেই অন্য সব সত্যের খোঁজ বাংলার মানুষ করবে। এরমধ্যে শক্তি আরাধনায় মত্ত বর্তমান সরকারের নেতাদের অনেকের হাঁড়ির খবরও বাংলার মানুষ জেনে যাবে। তারা বুঝবে একজন নাগনাথ হলে অন্যরা সাপনাথ। এই দুই থেকেই তারা মুক্তি চাইতে খুঁজবে ভূতনাথদের। যারা ওই সময়ে ভূতনাথের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে বাংলার মানুষ তাদেরই দু-হাত তুলে সমর্থন দেবে। যারা ছোট ছোট সভা সমিতি করবে আর সাধারণ মানুষের পাশে সাধারণ হয়েই থাকবে; শীর্ণকায় কঙ্কালসার-শরীর মানুষের পাশে যারা দাঁড়াবে বাংলার মানুষ আগামী দিনের চাবিকাঠি তাদের হাতে তুলে দেবে। সরকারে আসলে কি করবে তাও জোর জোরে বলতে হবে। লোভী মুখ নিয়ে গেলে মানুষ ধরে ফেলবে। গিমিক দেওয়া পার্টিকে সরকারে বসিয়ে কি ফল মানুষ তো দেখে নিয়েছে। তাই রাজনৈতিক 'গিমিক' করা চলবে না। অন্যায়কে অন্যায়, সত্যকে সত্য, মিথ্যাকে মিথ্যা বলতে হবে।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যেমন বর্তমান বাংলাকে পাকিস্তানে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন, এই বাংলাকে ভারতের সঙ্গে রাখতে পেরেছিলেন; পারবেন না তাঁর মন্ত্রশিষ্যরা এই বাংলাকে রক্ষা করতে? গ্রামবাংলার অর্থনীতিকে রক্ষা করতে? বাংলার যুবকের রোজগার যাতে অন্য রাজ্যের নাগরিকরা অন্যায়ভাবে ভোগ না করে তার ব্যবস্থা নিতে? যদি পারে এবং মানুষ যদি বিশ্বাস করে তবে এবার তাদের হাতেই তুলে দেবে বাংলার ভবিষ্যত। জাগ্রত জনতা তারই প্রহর গুনছে।

সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কীভাবে করা যায় তার পরিকল্পনাও সরকারে আসার আগেই মানুষকে দিতে হবে। বর্তমান সরকারের কোনও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নেই। এ ব্যাপারে তাদের বলার কিছুই নেই। তাই বিকল্প ব্যবস্থার কথা সাধারণ মানুষের মাঝে তুলে ধরতে হবে। ভালো খেলোয়াড় হতে গেলে যেমন শরীরের দিকে নজর দিতে হয় তেমনি দলের একটা শরীর আছে। তাকে সুস্থ সবল করে তুলতে হবে। শরীরের কোনও অংশে ব্যথা হলে যেমন আমরা বুঝতে পারি, তেমনিভাবেও দলটাকে সচল রাখতে হবে। কোথাও কিছু ঘটলে যাতে দ্রুত সবাই জানতে পারে। শরীরের কোন অংশ অসাড় হলে সেখানকার যন্ত্রণা আমরা বুঝতে পারি না, আর সেই শরীর কোনও কাজেও আসে না। তেমনি ওই রকম দল হলে তাও কোনও কাজে আসবে না। দলটাকে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষ এনে ভরতে হবে। কেউ উপেক্ষার নয়। কথায় আছে 'ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো', এটা মনে রাখতে হবে। আরও মনে রাখতে হবে শ্যামাপ্রসাদ নতুন দল গড়েই নয় জন এম এল এ-কে জেতাতে পেরেছিলেন, বাংলার মানুষই তাঁদের জিতিয়ে ছিলেন। তাই চাই নেতৃত্বের দৃঢ়তা। নির্ভয় হয়ে চলার শক্তি। চাই ভয়হীন, লোভহীন মানুষ জনের সমন্বয়, চাই নতুন বাংলার কারিগর হওয়ার বুকে তীব্র চাহিদা, তবেই জয় হবে। মানুষও বাঁচবে সঙ্গে দেশটাও বাঁচবে।

আগরতলায় স্বয়ংসেবক সম্মেলনে মোহন ভাগবত

‘ভারতমাতার সুরক্ষার জন্য হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করুন’

তাপস দত্ত॥ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ যশ, স্তুতি না চেয়েই ৮৬ বছর ধরে বেড়ে চলেছে। আত্মবিস্মৃতি, জড়তা ঝেড়ে শহরে নগরে গ্রামে পাহাড়ে সকল হিন্দু সগর্বে বলুন আমি হিন্দু, আমরা হিন্দু। হিন্দু সমাজ শক্তিশালী হলে বিদেশে সৃষ্ট দুটি বলশালী ধর্মোপাসনা পদ্ধতির অনুসারীরা ভারতমাতাকে আঘাতের সাহস পাবে না। এমন শক্তিশালী হিন্দু সমাজ গঠনে প্রত্যেক স্বয়ংসেবক নিজ দায়িত্বে আত্মবিশ্বাসসহ পালন করে চলুন। গত ১ জানুয়ারি আগরতলায় স্বয়ংসেবক সম্মেলনে এই আহ্বান জানান সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। সঙ্ঘের দক্ষিণ অসম প্রান্তের দৃষ্টিতে ত্রিপুরা সফরে এসেছেন তিনি। এই স্বয়ংসেবক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় পুরাতন আগরতলার অদূরে সেবা ভারতীর রাজ্য কার্যালয় সেবাধামে। সম্মিলিত স্বয়ংসেবকদের, স্থানীয় জনগণের এবং রাষ্ট্রহিতার্থীদের সামনে তিনি শ্রদ্ধাসহ স্মরণ করেন ১২ বছর পূর্বে নিহত চারজন প্রচারককে। তারা ১৯৯৯ সালের ৬ আগস্ট আগরতলা থেকে ৮২ মাইল দূরে পার্বত্য গ্রাম কাঞ্চনছড়ায় খৃস্টধর্মাবলম্বী এন এল এফ টি জঙ্গীদের হাতে অপহৃত হন। সঙ্ঘের এই চার প্রচারক শ্যামল সেনগুপ্ত, সুধাময় দত্ত, দীনেন দে ও শুভংকর চক্রবর্তীকে পরে হত্যা করে জঙ্গীরা।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, স্বয়ংসেবকদের শুধু সঙ্ঘের শাখাই নয়, সমাজ জীবনের বিবিধ ক্ষেত্রে প্রতিদিন কর্মনিষ্ঠ থাকতে হবে। ভারতমাতাকে সর্বক্ষেত্রে শক্তিশালিনী দেখতে চাইলে প্রত্যেক স্বয়ংসেবক আত্মতুষ্টি অগ্রাহ্য করে নিজ দায়িত্ব পালন করতে থাকুন। ভারতমাতার দেওয়া অন্নে, বস্ত্রে পালিত সত্ত্বেও দেশদ্রোহীরা যেন ভারতমাতাকে আঘাতের সুযোগ না পায়। হিন্দুসমাজকে সর্বাত্মক সংগঠিত করতে থাকুন, এই আহ্বান জানান শ্রীভাগবত। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্বধর্ম রক্ষায় লড়াকু জমাতিয়া দু'ভাই— নবকিশোর জমাতিয়া ও খঞ্জনপদ জমাতিয়া।

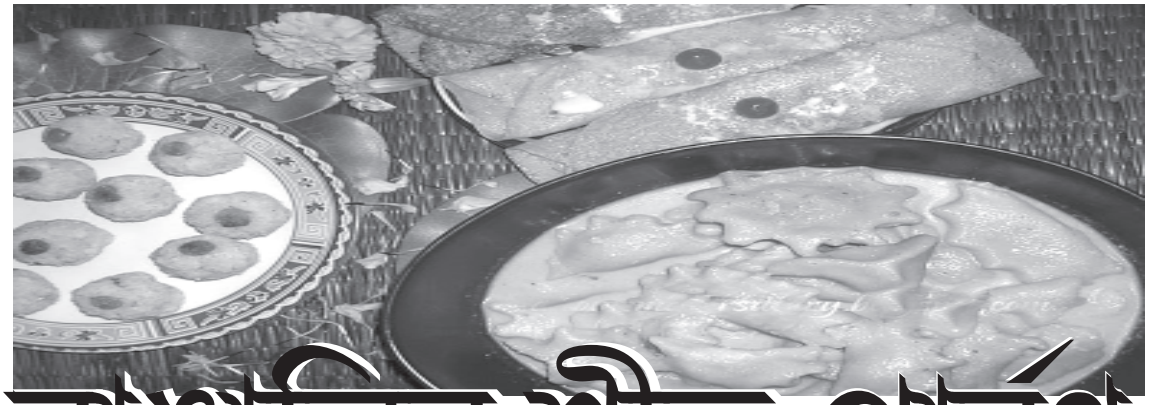

বাঙালির শীত-পার্বণ

অর্ণব নাগ

কি কুক্ষণেই যে শেলীসাহেব লিখেছিলেন, 'ইফ উইন্টার কামস, ক্যান স্প্রিং বি ফার বিহাইন্ড?' বাংলা তর্জমা করলে যার মানে দাঁড়ায়— শীত এলে, বসন্ত কি খুব দূরে থাকতে পারে? নেহাৎ-ই ঋতুচক্রের কথা। তবে বঙ্গবাসীর চটে যাওয়ার বিস্তর কারণ রয়েছে। শীত আসতে না আসতেই বসন্তের জন্য এহেন আকুলি-বিকুলিকে ভাল চোখে দেখা যায় না। বসন্তের দক্ষিণা বাতাস-টাতাস, মলয়স্নিগ্ধ সমীরণ-টমীরণ তারপর কোকিলের গুঞ্জন-টুঞ্জন বঙ্গকাব্যে দিব্যি মানায়, তবে বাস্তবে ফেব্রুয়ারি-মার্চের (বাংলায় ফাল্গুন-চৈত্র, অর্থাৎ কি না বসন্তকাল) প্রাক্‌গ্রীষ্মের গরমে 'চৈত্রের চিতা ভস্ম উড়াইয়া, জুড়াইয়া জ্বালা পৃথ্বি'র ন্যায় কেবল কালবৈশাখী ছাড়া বায়ুপ্রবাহের আর কোনও দস্তুরই বিশেষ সমাদর লাভ করে না। ইদানীং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলকাতাকে লন্ডন বানানোর প্রতিশ্রুতি নিয়ে নানান রসিকতা চালু হয়েছে। যার মধ্যে সাম্প্রতিকতম হলো কলকাতার এই মরসুমের শীতকে লন্ডনের শীতের সঙ্গে তুলনা করা।

আর এখানেই শেলী সাহেবের সেই অসামান্য উক্তির তাৎপর্য। এমনিতেই ঠাণ্ডার দেশ, তায় শীত জাঁকিয়ে পড়লে বিলেতের নগরজীবনে একটিমাত্র রঙ-ই অবশিষ্ট থাকে; সেটা হলো ধূসর। বরফে ঢাকা সেই শীতকালীন দৃশ্যপট পরিবর্তনের জন্য তাই এঁদের কাছে বসন্তকালের গুরুত্ব অপরিসীম। সুবিখ্যাত বৃটিশ কবি পার্শিবেসী শেলীর কাছে মার্জনা চেয়ে তাঁর সেই অমূল্য পংক্তির ভাবসম্প্রসারণ করে ফেলা যাক— 'যদি দুঃখ (অর্থাৎ শীত) আসে, তবে সুখ (অর্থাৎ বসন্ত) খুব দূরে নেই।"

প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন কিংবা সাহেব ও বাঙালি-সাহেবদের সাদৃশ্য নিয়ে চুলচেরা বিচার মনীষী থেকে শুরু করে পাড়ার চায়ের দোকানের কেষ্টাদা পর্যন্ত অনেকেই করেছেন। কিন্তু প্রাচ্যে শীতকে দুঃখ বলে ভেবেছেন, এক কলকাতার ফুটপাথবাসী ও অসুস্থ মানুষ ছাড়া, এর নজির মেলা ভার। সুতরাং প্রাচ্য-পাশ্চাত্য মেলবন্ধনের প্রধান বাধা যে শীতের প্রতি দু'দেশের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী একথা হলফ করে বলে দেওয়াই যায়! নইলে দেখুন না, দার্জিলিং কিংবা কাশ্মীরে জল যতই 'বরফ' হয়ে আত্মপ্রকাশ করুক না কেন, তুমুল শীতেও 'পর্যটক টানে' এদের কোনওদিন কোনও খামতি দেখেছেন? বিলেতের লোক এসব দেখলে তো পাগল বলতো! আর জবুথবু হয়ে জমে যেতে যেতে কল্লোলিনী তিলোত্তমার যে প্রাণ-স্ফুরণ ঘটে তা বিশ্ব ইতিহাসে নিঃসন্দেহে অদ্বিতীয়।

শীতের আমেজ

বিশ্বকর্মা পুজো থেকে শুরু। তারপর একে একে দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো, ভাইফোঁটা, শেষে জগদ্ধাত্রী পুজো। পুজোর গন্ধটা চলে যাওয়ার শোকে মুহ্যমান হওয়াটা আমাদের মানায় না। কারণ বারো মাসে তেরো পার্বণওয়ালা বাঙালির ত্রয়োদশতম পার্বণটার নাম অবশ্যই শীত পার্বণ! কার্তিক সংক্রান্তিতে ইতুর ঘট আর শীতের পট যুগপৎ বঙ্গদেশে শীতকে সাদর সম্ভাষণ জানায়। ভোরের দিকে কুয়াশা, রাতের দিকে ধোঁয়াশা আর রাত বাড়লে কলকাতার রাস্তায় সোডিয়াম ভেপারের ছাগলের চোখের ঘোলাটে দৃষ্টির মতো আলো, তবে সব কিছু ছাপিয়ে বাজারে নতুন ওঠা নিষ্পাপ শিশুর মতো ফুলকপি এবং সোয়েটার সহ গরম জামা-কাপড় ও লেপ-কম্বলের বাক্সবন্দি অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া বাঙালির শীত-পার্বণের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে। তবে এই শীত-পার্বণের সূচনার অন্য একটা জব্বর সিম্পটমও রয়েছে! দেখবেন বাজার থেকে আর পাঁচটা মুখরোচক খবর হঠাৎ-ই ব্যাকফুটে। সামনের সারিতে কেবল দিনের উষ্ণতার পারদ ওঠা-নামার খবর। বুঝবেন শীত-পার্বণ সমীপে! তবে ভোরের বেলা ক্রিকেট ব্যাট কিংবা মাথায় হনুমান টুপি পরে মর্নিংওয়াক, শীতের আমেজের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞাপন হতে পারে।

শীতের প্রকৃতি

প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে ব্যাপারটা বেশ অস্বস্তিকর। রুক্ষ প্রকৃতিতে প্রকৃতির প্রতি প্রেমটা ঠিক জমে না কিনা! এর আগে শান্তিনিকেতনেও দেখেছি, এই সেদিন কলকাতার ফুসফুস ময়দানে প্রায় দেড় ইঞ্চি পুরু ধুলো আর বালুকারাশি ঠেলে হাঁটতে হাঁটতেও দেখলাম পাতাগুলো সব ঝরে যাচ্ছে। বৃক্ষরাজির দুঃখে সমব্যথী হতে চেঁচিয়ে গান ধরতে ইচ্ছে হলো— 'ঝরা পাতা গো আমি তোমারই দলে'। আশপাশের মানুষজনের উপস্থিতি সে ইচ্ছেয় বাদ সাধলো বটে, তবে হর্টিকালচার গার্ডেনে গিয়ে আর সামলাতে পারলুম না।

এই অ-সুর গলা থেকেই সুর বেরোলো— 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে-বহে কি বা মৃদু বায়।' ভাগ্যিস শোনার জন্য কেউ ছিলেন না! ডালিয়া, গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, গাঁদা, সূর্যমুখী ফুলের অনবদ্য শীতকালীন সমাহার রুক্ষ প্রকৃতির যাবতীয় দুঃখ ভুলিয়ে দিতে যথেষ্ট।

শীতের অতিথি

শীতের কলকাতা তার অতিথিদের উষ্ণ

অভ্যর্থনা জানায়। মানে জানাতে বাধ্য হয় আর কি! প্রকৃতপক্ষে অতিথিরা তাদের উষ্ণপরশে শীতের শহরকে জড়িয়ে না ধরলে, শহরবাসীর কেঁপে মরা ছাড়া গতি থাকতো না। বিষয়টা খোলসা করা যাক। উত্তর কলকাতার হেদুয়ার ধারে শীত পড়তে না পড়তেই সুদূর পার্বত্য এলাকা থেকে আসা ভুটিয়াদের সোয়েটার ব্যবসা জমে ওঠে। প্রথমদিকে এঁরা ব্যবসা ফেঁদেছিলেন ধর্মতলায় মেট্রো সিনেমার পাশের গলিতে। তারপর ওখান থেকে উঠে আসেন মধ্য-কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। সেখানে আজও ব্যবসা চলছে ভুটিয়াদের। তবে বহুবছর ধরেই হেদুয়া পার্কের সামনের রাস্তায় ভুটিয়াদের সোয়েটার-সাম্রাজ্য চলছে রমরমিয়ে। প্রথম প্রথম মোটা উলের যেসব সোয়েটার (কলকাত্তাইয়া ভাষায় কুটকুটে সোয়েটার) গছাতেন তাঁরা, তাতে শীত নিবারণ কতটা হোত সেটা গবেষণার বিষয় তবে চুলকানিটা হোত বিলক্ষণ। পরে অবশ্য ব্যবসার খাতিরে অনেকটাই শুধরে যান সেই ভুটিয়া ব্যবসায়ীরা। এঁদের কোনও ফিক্সড প্রাইস নেই, কিন্তু কলকাতার যে কোনও শপিং মলের সঙ্গে সোয়েটারের গুণগত মানে এঁরা টেক্কা দিতে পারেন। উপরন্তু দামটাও বেশ সস্তা। দরদাম করে কিনতে পারলে ঠকার সম্ভাবনা ৯৯ শতাংশ কম। এই ফাঁকে চুপি চুপি একটা গোপন খবর দিয়ে রাখি। নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে পরের বছরের ফেব্রুয়ারির গোড়া— বড়জোর মাস চারেক এঁদের কলকাতায় আয়ু। ফেব্রুয়ারির শুরুতে ফেরবার মুখে হাঁটি হাঁটি পায়ে হাজির হয়ে যেতে পারেন হেদোয় এঁদের ডেরায়। অভাবনীয় কম দামে রোগা-মোটা, হাফহাতা- ফুলহাতা উলের সোয়েটার থেকে মাফলার কিংবা কানঢাকা টুপি পেয়ে যেতে পারেন সবই।

শীতের বিশেষ অতিথি

বাঙালির শীতকালীন মন খারাপ। বেশ ক'বছর ধরেই হচ্ছে। সাঁতরাগাছির ঝিল, উত্তর দিনাজপুরের কুলিক, বীরভূম জেলার যজ্ঞনগর, ঝাড়গ্রামের কেন্দুয়া পরিযায়ী পাখিদের কলতানে আর সেভাবে মুখরিত হয় না। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে নাকাটা, কমনটিল, বড় দিঘর, খুন্তে হাঁস, পিকিং হাঁসেরা শীতের সময় উড়ে আসে এই বঙ্গদেশে। শুধু ইউরোপ-ই বা বলি কি করে, এখানকার শামুকখোলের মতো দেখতে একধরনের পাখি শ্রীলঙ্কা আর তার আশপাশের দ্বীপ থেকে উড়ে আসে বোলপুর থেকে ১০ কিমি দূরে যজ্ঞনগর গ্রামে। আবার দক্ষিণ এশিয়ার বিল স্টক, নাইট হেরন, কর্মর‍্যাপ্ট, এগ্রেটস ইত্যাদি খটমট নামের সব পাখিরা উড়ে আসে এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম পক্ষীনিবাস উত্তর দিনাজপুরের কুলিকে। ওই জায়গাগুলোতেই শুধু নয়, কলকাতার সুভাষ সরোবর বা চিড়িয়াখানাতেও পরিযায়ী পাখীদের অবাধ আনাগোনা শীতে। পক্ষীপ্রিয় কচি-কাঁচাদের কাছে এরা যে 'বিশেষ অতিথি'র মর্যাদা পাবে তাতে আর আশ্চর্য কি? তবে কিনা 'বিশেষ অতিথি'দের শীতকালীন সমাগম বেশ ক'বছর ধরেই চোখে পড়ার মতো কম। বিশ্ব উষ্ণায়ণসহ অন্যান্য পরিবেশগত জটিলতাকে এর জন্য যতই ভিলেন সাজাই না কেন, এ ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনিক অকর্মণ্যতাও নেহাত কম নয়। পাখি শিকারীদের তাণ্ডব রুখতে প্রশাসনের চেয়ে স্থানীয় পাখীপ্রেমী মানুষকেই এতকাল অগ্রণী ভূমিকা নিতে দেখা গেছে। তাই শীতের 'বিশেষ অতিথি'দের এহেন বিমুখতা হিমেল পরশের মাঝে বিষণ্ণতার ছোঁয়ায় বঙ্গহৃদয়কে ব্যথিত করে যাচ্ছে।

শীতের অতিথি : মহানগরীর বুকে গরম পোশাকের পসরা নিয়ে হাজির ভুটিয়ারা।

শীতের খাওয়া-দাওয়া

এটা কিন্তু মশাই অস্বীকার করে লাভ নেই যে শীত পার্বণের আসল সুখ পেট-পুজোয়। শীতে খায়, গরমে ফোলে (মানে মোটা হয়)— কথাটা খুব একটা মিথ্যে নয়। ৩০ টাকা কেজির পটলের জুস খাওয়ার থেকে গরম ধোঁয়া ওঠা ৫ টাকা পিসের ফুলকপি দেখলে কার না সুখ হয় বলুন? এরপর ধরুন, মাটি লাগা, খোসা ওঠা, স্যাঁতস্যাঁতে নতুন আলু রয়েছে। যে আলুর দম ডায়াবেটিক রোগীদের তাদের ডায়েবেটিস-জনিত কৃতকর্মের জন্য আফসোসের কারণ হয়। এরপর কড়াইশুঁটি রয়েছে। যার কচুরী (সাবেকী নাম রাধাবল্লভী)-র স্বাদ ও গল্প কোলেস্টেরল রুগীদের প্রবল মনোবেদনার কারণ হতে পারে। শীতে আরও যা যা মিলতে পারে তার সংক্ষিপ্ত তালিকা— মুলো (লাল ও সাদা উভয় প্রকার), সিম (সবজেটে ও সাদা উভয় প্রকার), বাঁধাকপি, বীট, বিলিতি গাজর, সস্তায় টমেটো, ধনেপাতা, বীনস, পালং শাক ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে সবার চাইতে ভাল জয়নগরের মোয়া আর নলের গুড়। নলেন গুড়ের সন্দেশ, রসগোল্লা থেকে পায়েস, শীতে খাবেন না তো কখন খাবেন? শীতের দীর্ঘ খাদ্য-তালিকার পাশে খাদ্য উৎসবের দিকেও নজর রাখছেন নিশ্চয়ই। পৌষ-পার্বণের পাটিসাপ্টা, পিঠেপুলি আর সরু চাকলি কিংবা নারকোল ছাপা খাননি এমন বাঙালি ভূ-ভারতে মাথা খুঁড়ে খুঁজলেও মিলবে না।

শীতের উৎসব

খবরের কাগজ আর টিভি চ্যানেলগুলোর দৌরাত্ম্যে ইদানীং বাঙালির কাছে শীতের উৎসব বলতে মনে হয় যেন ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন থেকে ১ জানুয়ারি নিউ ইয়ার পালন করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও উৎসব-ই নেই। অবশ্য ১৮৮৬-র ১ জানুয়ারি ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণপরমহংসদেবের 'কল্পতরু' হওয়া উপলক্ষে ইদানীং 'কল্পতরু' উৎসব পালনের একটা শুভ উদ্যোগ শুরু হয়েছে। তবে বাঙালির শীতের উৎসব বলতে পৌষ-পার্বণের আজও কোনও বিকল্প নেই। গ্রাম বাংলায় পৌষ সংক্রান্তিতে (মকর সংক্রান্তি) উৎসবের বহরটা শহরে বসে উপলব্ধি করা একান্তই অসম্ভব। গ্রামে

ওইদিন সকালে আলো চাল, দুধ, বাতাসা, সন্দেশ, তিল, ফল ইত্যাদি দিয়ে মায়ের মন্দিরে পুজো দেওয়ার নিয়ম। 'ক্ষেত বাড়ানো' বলে গ্রামের দিকে কথার একটা চল আছে। মানে অগ্রহায়ণ-পৌষে আমন ধান উঠলে জমিতে নির্দিষ্ট স্থানে গর্ত করে শীষ, খড় সমেত একগোছা ধান পুঁতে রাখা হয়। পৌষ-সংক্রান্তির বিকেলে সেটা তুলে শাঁখ বাজাতে বাজাতে আর ঘটি থেকে জল ছড়াতে ছড়াতে পড়ন্ত সূর্যের আলোয় যে দীর্ঘ পদযাত্রা করেন গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা, তা সত্যিই নয়নাভিরাম। ফুল, ধান-দূর্ব্য, মিষ্টি দিয়ে 'ক্ষেত বাড়ানো'র স্থলে পুজোও একটা দেখার জিনিস। রাতের দিকে বাড়ির উঠোনে পিঠে-পুলির চালের গুঁড়ো দিয়ে মই, লক্ষ্মীর আসন ইত্যাদির আলপনা

শীতের সেরা বিজ্ঞাপন : কুয়াশাঢাকা শীতের ভোরে টুপি মাথায় শারীরিক কসরৎ।

এঁকে উঠোনের মাটিতেই প্রশস্ত 'লক্ষ্মীর সিংহাসন' প্রস্তুত করা হয়। যার কেন্দ্রে শীষ সমেত ধানের ধামা থাকে। খুবই মজার ব্যাপার যে শেয়াল বা অন্য কোনও পশু চিৎকার করে উঠলেই লক্ষ্মীর সিংহাসনের চারপাশে ঘটি করে জল ছড়ানোর নিয়ম-রীতি আছে। একে 'সার ধরা' বলা হয়। এরপর রাতে মালক্ষ্মীর পুজো হয়। পূজারী হিসেবে ব্রাহ্মণদের কদর রয়েছে। তবে এই উৎসবের পরদিন অর্থাৎ মাঘপয়লায় কোনও কর্ম করার রেওয়াজ নেই। অমন নির্ভেজাল ছুটিতে শীতের অলস দিনের আমেজটুকু তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে গ্রাম-বাংলা। শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা রাঙা মাটির দেশকে রাবীন্দ্রিক সুরের রঙে রাঙিয়ে তুলে আরও রঙীন করে তোলে এই শীতকালীন আবহেই। শীতের উৎসবের আরও দুই শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ গঙ্গাসাগর মেলা ও সরস্বতী পুজো। গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে মকর-সংক্রান্তির বহু আগে থেকেই কলকাতার বাবুঘাটে সাধু-সমাগম শীতের আনন্দে ভিন্নমাত্রা যোগ করে আর বিদ্যেদেবীর আরাধনা তো পাড়ায়-পাড়ায়, স্কুলে-স্কুলে, ঘরে-ঘরে। তবে দেবী সরস্বতীর বাহন হাঁসের ডানায় ভর করে যে শীত পালায়, পরীক্ষা করে দেখেছি কথাটা সেন্টপার্সেন্ট সত্যি!

শীত-পার্বণী

কোনও ঋতুকে কেন্দ্র করে যে একটা ম্যারাথন পার্বণ চলতে পারে, সেটা মশাই বঙ্গবাসীদের না দেখলে বোঝার উপায় নেই। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কিংবা চিড়িয়াখানা এই শীতের মরসুমে বঙ্গজনের কাছে তীর্থের রূপ পরিগ্রহ করে হট্টমেলায় রূপান্তরিত হয়। আপনি এসব দেখতে গেলে সঙ্গে অবশ্যই গোটাকতক কমলালেবু নিতে ভুলবেন না। আঙুলের সব নখ কেটে ফেলবেন। সেটাই স্বাস্থ্য বিধি। শুধু বুড়ো আঙুলেরটা একটু রাখবেন। যাতে আলতো চিপে কমলালেবুর খোসা ছাড়াতে পারেন। এটাই দস্তুর। আগেকার দিনে শীতের কলকাতায় ইডেন গার্ডেনস তথা টেস্ট-ক্রিকেটের একটা আলাদা আকর্ষণ ছিল। বিখ্যাত সব ফাস্ট বোলাররা বল করতে আসতেন। ঠাণ্ডা আমেজে, ইডেনের পাশ্ববর্তী গঙ্গার হাওয়ায় সকালের দিকে পেস বোলারদের সুইং আর গাভাসকার, বিশ্বনাথ কিংবা হালফিলের ভি ভি এস লক্ষ্মণ-রাহুল দ্রাবিড়ের মতো প্রকৃত টেস্ট ব্যাটসম্যানদের ডুয়েল দেখার জন্য মাঠ ভরে থাকতো। সঙ্গে উপরিপাওনা ছিল বাড়ি থেকে তৈরি করে নিয়ে গিয়ে লাঞ্চে বা টী-তে ভুরিভোজ। এখন টি-২০-র দৌলতে টেস্টক্রিকেটের পড়তির বাজার, বছরভর ক্রিকেট, শীতকালে ক্রিকেট ছাড়াও সব খেলাই হওয়া ইত্যাদি নানাবিধ কারণে শীতের ক্রিকেটের সে দিন অস্তমিত। তবে ঘরে ঘরে শীতের রাতের ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেটের আকর্ষণ আজও অপ্রতিহত। এখন বিনোদনের মাধ্যম এত হয়ে গিয়েছে যে শীতের কলকাতার একদা শ্রেষ্ঠ বিনোদন সার্কাস তার আভিজাত্য হারিয়েছে অনেকটাই। তবে ট্রপিজের খেলা দেখতে কিংবা চোখের সামনে বাঘ- সিংহের খেলা দেখতে (চিড়িয়াখানায় দেখা এক জিনিস, আর সার্কাসে দেখা অন্য অভিজ্ঞতা) এখনও এত মানুষ ভিড় জমান যাতে মনে হয় অজন্তা কিংবা অলিম্পিকের মতো সার্কাস-কোম্পানীগুলি ধারে না কাটলেও আজও ভারে কাটছে। তবে এই হাজারো বিনোদনের যুগেও শীতের রোববার বা ছুটির দিনে অবসর কাম বিনোদনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে পিকনিকের ভূমিকা আজও অম্লান। ইদানীং কলকাতায় শীতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে স্বামীজী'র নামাঙ্কিত মেলা ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত মেলার খুব চল হয়েছে। যেমন— হেদুয়ায় বিবেক মেলা, হাতিবাগানে বিজ্ঞান চেতনা মেলা ইত্যাদি। এর একটা কারণ অবশ্যই স্বামীজী'র শীতে (১২ জানুয়ারি) জন্মদিন, আর দ্বিতীয় কারণটা অবশ্যই শীতের সন্ধ্যায় কলকাতাবাসীর উৎসবমুখর মেজাজ।

তবে সব মেলার সেরা বইমেলার আকর্ষণ আজও দুর্নিবার। এখন তো কলকাতা বইমেলা ছাড়াও সুতানুটি, বাগুইআটি ইত্যাদি অঞ্চলে আঞ্চলিক বইমেলাও শুরু হয়েছে। আসলে এসব যে শীতেই করতে হবে তার কোনও মানে নেই। আসলে সূর্য ডোবার পালা দ্রুত সাঙ্গ হতে না হতে হিমশীতল পরশে যে উৎসবমুখীনতার স্ফূরণ ঘটে, যে আলোকমালা নিরাভরণ কলকাতাকে অলংকারে সজ্জিত করে তা অস্বীকার করার ক্ষমতা নেই কারও।

শীতের কষ্ট

এতক্ষণ যে শীত-পার্বণের কথা হলো, সেটা তাঁদের কাছেই আনন্দের যাঁরা শীতে গরম জামা-সোয়েটার পরতে পারেন, যাঁদের মাথায় ছাদ আছে আর শীতের খাদ্য-সম্ভার আস্বাদনের সামর্থ্য যাঁদের রয়েছে। কিন্তু রাজ্যের যে অসংখ্য গরীব মানুষের এসবের বালাই নেই, কলকাতার ফুটপাথে যে অগুণতি মানুষ মাথার ওপর ছাদহীন অবস্থায় দিন কাটান আর ভিক্ষে করে যাঁদের জীবন চলে তাঁদের কাছে কিবা শীত, কিবা গ্রীষ্ম। বরং শীত তাঁদের কাছে একপ্রকার বিভীষিকাই। হিমেল হাওয়ার সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুঝেই তাঁদের জীবনধারণের লড়াই। শীত-পার্বণের এক কলঙ্কিত সত্তা।

শীতের মেলা

নবকুমার ভট্টাচার্য

শীতের মেলা। মেলা মানেই মিলনক্ষেত্র অর্থাৎ মেলবন্ধন। এক জেলার মানুষ আর এক জেলায় গিয়ে ভিড় করছেন। মেলায় হঠাৎ করে কোনও চেনা মুখের দেখা মিলতেই পারে।

বড়িশার চণ্ডীমেলা :

অঘ্রাণ মাস। মাঠে ফসল কাটা হয়েছে। গোলায় উঠছে সোনার ধান। চারিদিকে নবান্ন উৎসবের তোড়জোড়। এই সময়েই বড়িশার চণ্ডী মন্দিরে শুরু হয় বোধন পুজো ও চণ্ডীর মেলা। বড়িশার চণ্ডীপুজো ও মেলা শুরু হয় বাংলার ১২০০ বঙ্গাব্দে। সাবর্ণ চৌধুরী বংশের মহেশ রায়চৌধুরী। শোনা যায় দেবী চণ্ডী তাঁকে মন্দির তৈরির স্বপ্নাদেশ দেন। তাঁর দালান কোঠার পাশের পুকুর থেকে ভেসে ওঠে অষ্টধাতুর ঘট। সেই ঘট আজও রয়েছে সাবর্ণ চৌধুরীদের বংশধর নিমাই রায়চৌধুরীর বাড়ীতে। বড়িশার চণ্ডীপুজোর অন্যতম আকর্ষণ এখানকার শুক্লাঅষ্টমীর মেলা। পুজো উপলক্ষে প্রতি বছর ১৫ দিন ধরে চলে মেলা।

পাণ্ডুয়ার মাঘীমেলা :

হুগলি জেলার পাণ্ডুয়াতে প্রত্যেক বছর অনুষ্ঠিত হয় মাঘীমেলা। চলে এক মাস ধরে। গুপ্ত যুগে নাকি এই মেলার সূচনা হয়েছিল। আজকের পাণ্ডুয়ার মুসলমান শাসকদের বিজয়স্তম্ভ অর্থাৎ মিনারকে কেন্দ্র করে এই মেলার বিস্তার। পাণ্ডুয়ার মিনার দিল্লীর কুতুবমিনারের অনুকরণে তৈরি। উচ্চতা ১২৫ ফুট। এই মিনারে ১৬১টি সিঁড়ি আছে। অথচ এই মিনারটি এক সময় পাণ্ডুয়ারাজার বিষ্ণুমন্দিরের সর্বোচ্চ চূড়া ছিল। কিংবদন্তী, পাণ্ডুয়ায় পাণ্ডু রাজবংশের শাসন কায়েম করেছিলেন পাণ্ডুশাক্য। ইনি ছিলেন স্বয়ং বুদ্ধদেবের বংশধর। দিল্লীর মুসলমান শাসনকালে শাহ সুফিউদ্দিন পাণ্ডুয়ার হিন্দু রাজাকে পরাজিত করে মন্দির ধ্বংস করেন। কিন্তু সর্বোচ্চ চূড়াটিকে বিজয়স্তম্ভ হিসেবে রেখে দেন। ১৩৪০ সালে এটিকেই সংস্কার করে আজানের জন্য মিনার তৈরি করেন। ভাঙা মন্দিরের উপকরণ দিয়েই তৈরি হয় বাইশ দরওয়াজা। বিষ্ণুমন্দিরের মাঘমেলাই আজকের পাণ্ডুয়ার মাঘমেলা।

কিরীটেশ্বরী মেলা :

মুর্শিদাবাদ জেলার কিরীটেশ্বরী মেলা। মেলা বসে পৌষ মাসের প্রতি মঙ্গলবার। আজিমগঞ্জ স্টেশনের কাছে ডাহাপাড়া হল্ট স্টেশন। সেখানে নেমে হাঁটাপথে মাইল দুয়েক রাস্তা। ৫১ পীঠের এক পীঠ। সতীর কিরীট অর্থাৎ মুকুট থেকে এসেছে এই নাম।

ফুলিয়ার কৃত্তিবাসের মেলা :

নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রাম কবি কৃত্তিবাস ওঝার জন্মস্থান। কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা নাকি ফুলিয়ার নামকরণ করেছিলেন। শোনা যায় গ্রামের রামসাগরের তীরে বটগাছের তলায় বসে কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেছিলেন। সেই ঘটনাকে স্মরণ করেই বসে কৃত্তিবাসের মেলা। মাঘমাসের শেষ চারদিন ধরে চলে এই মেলা।

জল্পেশ মেলা :

ট্রেনে শিলিগুড়ি। সেখান থেকে বাসে 'গড়তালি জল্পেশ' গ্রামে জল্পেশ শিবমন্দিরকে কেন্দ্র করে মেলা বসে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ চর্তুদশীর দিনে। শেষ হয় দোলপূর্ণিমাতে। তিস্তা নদী থেকে বাঁকে করে জল নিয়ে এসে ভক্তরা উপস্থিত হন মন্দিরে।

আমডাঙায় করুণাময়ী মেলা :

উত্তর ২৪ পরগণার আমডাঙা দেবী করুণাময়ী অধিষ্ঠানক্ষেত্র। মা করুণাময়ীকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর ২৫ ডিসেম্বর এখানে মেলা বসে। মেলা চলে তিন দিন।

কেদার ভুটভুটির মেলা :

হাওড়া থেকে খড়্গপুর লোকালে বালিচক স্টেশনে নেমে চলে যান চণ্ডীপুর স্টপেজ। সেখানেই মকরসংক্রান্তিতে বসে কেদার ভুটভুটির মেলা। এখানকার মন্দিরটি বেশ প্রাচীন। মন্দিরের প্রবেশদ্বারে গরুড়মূর্তি। মন্দিরের পাশে কুণ্ড। এই কুণ্ড থেকে অনবরত বুদবুদ ভেসে ওঠে ভুটভুট শব্দ করে। তাই মন্দিরের নাম কেদার ভুটভুটি।

মটগোদার শনি মেলা :

বাঁকুড়া শহর থেকে ৪২ মাইল পথ পেরলে রায়পুর থানা। সেখান থেকে আরও ৩ মাইল পরেই মটগোদা গ্রাম। গ্রামের জাগ্রত গ্রাম্যদেবতা ধর্মরাজের পুজো উপলক্ষে মাঘ মাসের শেষ শনিবার বসে মেলা। এই মেলার অন্য এক নাম সাঁওতালী মেলা। মেলাভর্তি তাই সাঁওতালদের গহনার দোকান।

কেন্দুলির জয়দেব মেলা :

বীরভূম জেলার সীমান্তে অজয় নদের তীরের গ্রাম কেন্দুলি, ডাকনামে কেঁদুলি। রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেবের স্মৃতিতে প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তিতে বসে তিন দিনের জয়দেব মেলা। বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার বাউল এই মেলায় উপস্থিত হন।

খেলাই চণ্ডীর মেলা :

পুরুলিয়ার সবুজ পাহাড়ের খাঁজে একটি গ্রাম বোরো। এই গ্রামটির আশেপাশে কয়েকটি পাহাড়। তাদেরই একটির নাম চণ্ডী পাহাড়। এখানে মাঘ মাসে বসে খেলাই চণ্ডীর মেলা। মেলার মাঠের মাঝখানে পুকুরপাড়ে খেলাই চণ্ডীর মন্দির।

ময়দার মাঘীমেলা :

দক্ষিণ ২৪ পরগণার প্রাচীন তীর্থস্থান ময়দা। আদি গঙ্গার তীরে ময়দা এক সময় ছিল সুন্দরবন অঞ্চলের অন্যতম প্রধান বন্দর। এই আদি গঙ্গার তীরে দক্ষিণাকালীর মন্দির উপলক্ষে বসে মাঘীমেলা। ময়দা গ্রামের পশ্চিমে ১১৭৬ সালে এই মন্দিরটি তৈরি করেন জমিদার গদাধর চৌধুরী। মন্দিরের পাশে পবিত্র কুণ্ড।

কুলিয়ার মেলা :

ত্রিবেণীতে অবস্থিত কুলিয়া গ্রাম। জেলায় অবস্থিত এই গ্রামটি বৈষ্ণবদের পবিত্র তীর্থস্থান। প্রায় ৫০০ বছরের প্রাচীন মন্দিরটি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভক্তি ও প্রেমের সাক্ষ্য বহন করছে। প্রতি পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশী তিথিতে মেলার সূচনা হয়। মেলায় বিশেষ আকর্ষণ বাউল ও শিল্পীদের গান।

শিবনিবাসের মেলা :

নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বিতীয় রাজধানী ছিল শিবনিবাস। শিবনিবাসের রাজরাজেশ্বর মন্দিরের উচ্চতা ১২০ ফুট। রাজরাজেশ্বরের মতো এত বড় শিবলিঙ্গ পূর্ব ভারতে দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। কষ্টিপাথরের লিঙ্গটির উচ্চতা ৯ ফুট এবং বেড় প্রায় ২২ ফুট। ১৭৩৪ সালে মাঘ মাসের ভৈমী একাদশী তিথিতে দেবালয়টি স্থাপিত হয়। সেই থেকে প্রতি বছর ওই ভৈমী একাদশীতে মেলা বসে।

মূল্যবোধের সাফল্যমন্ত্র

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ স্বনামধন্যা কুচিপুড়ি নৃত্যশিল্পী ইয়েমিনি রেড্ডি কিংবা বিখ্যাত ফ্যাশন ডিজাইনার যতীন কোচ্চার বা প্রখ্যাত লেখিকা মেঘা মুখোপাধ্যায় অথবা নামকরা পরিবেশবিদ রজত চৌহ্বান। চার পেশার চার নামী মানুষ। আপাতদৃষ্টিতে এঁদের কোনও মিল থাকার কথা নয়। তবু আছে। খুব গভীর ভাবেই আছে। আছে সবার অলক্ষ্যে। আচ্ছা সত্যি করে বলুন তো আজকালকার কোনও সফল ব্যক্তিকে তাঁর সাফল্যের পেছনে নিজের পরিশ্রম, নিষ্ঠা বা নিকট কারুর অবদানের বাইরে আর কোনও কিছু স্বীকার করতে দেখেছেন? একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কোনও মানুষের সাফল্যের পেছনে তাঁর পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং কারুর না কারুর অবদান থাকবেই। কিন্তু তথাকথিত সব সফল ব্যক্তির সাফল্যই কি হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিখুঁত? বাস্তব অভিজ্ঞতা বলছে— না, একদমই তা নয়। ভারতবর্ষের প্রাচীন পরম্পরা শিখিয়েছে সাফল্য মানুষকে নিরভিমান করে, নিরহঙ্কারী করে, বিনয়ী করে। আর এসবের পেছনে কাজ করে মানুষের মূল্যবোধ। প্রকৃত সাফল্যে মূল্যবোধের অপরিসীম ভূমিকার কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে নিয়েছেন ওই চারজন অর্থাৎ ইয়েমিনি রেড্ডি, যতীন কোচ্চার, মেঘা মুখোপাধ্যায় ও রজত চৌহ্বান। এমনটা আজকালকার দিনে আর দেখা যায় না। ওই চারজনের কথা আপনাদের শোনাবো। আপনারাই বিচার করবেন আজকের 'অন্যরকম' কি ওঁরা না কি আগাপাস্তালা মূল্যবোধটাই?

ইয়েমিনি রেড্ডি

যতীন কোচ্চার

মেঘা মুখোপাধ্যায়

রজত চৌহ্বান

ইয়েমিনি রেড্ডি দৃঢ় প্রত্যয়ে জানাচ্ছেন, ''মূল্যবোধ আমাদের জীবনে খুবই দরকারি। আমি মনে করি আমাদের প্রত্যেকের কিছু নির্দিষ্ট নীতি রয়েছে এবং সেই নীতির ওপর ভিত্তি করে আমাদের মধ্যে উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। যদি অন্তরের অন্তস্থল থেকে উঠে আসা এই মূল্যবোধগুলোকে চিহ্নিত করতে পারি এবং আমাদের জীবনে প্রতিফলিত করতে পারি তবে সাফল্য আপনি ধরা দেবে।'' যতীন কোচ্চার মনে করছেন, নিজের মূল্যবোধে অটল থাকলে জাগতিক কোনও কিছুতেই কেউ ডরাবে না। তিনি বলছেন, ''আমি সবসময় বিশ্বাস করি আপনার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে সংহতি (ইন্টিগ্রিটি) ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবং যদি কোনও ভুল না করেন তবে বিশ্বের কোনও কিছুকেই আপনি ভয় করবেন না। আমার কাছে জাগতিক কোনও কিছু হারানোর চেয়ে নিজের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস হারানো অনেক বেশি পীড়াদায়ক।'' তবে মেঘা মুখোপাধ্যায় এনিয়ে খুব মূল্যবান কিছু কথা বলেছেন, ''জীবনে মূল্যবোধ হলো সেরকমই একটা কিছু, যেটা তোমাকে খুব ভালভাবে বর্ণনা করতে পারবে। প্রত্যেক মানুষের জীবনে কিছু নির্দিষ্ট নীতি রয়েছে এবং সেগুলোতে কেউ দৃঢ় থাকলে জগতের কোনও কিছুই তার কাছে বাধা নয়। জীবনের উত্থান-পতনের মূলে এগুলোই কিন্তু শক্তি জোগায়।'' পরিবেশকে নিজের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার অঙ্গ করে নিয়েছেন বিখ্যাত পরিবেশবিদ রজত চৌহ্বান। আর একাজে তাঁর সবচেয়ে সহায়ক যে মূল্যবোধই তা বলাই বাহুল্য। শ্রী চৌহ্বানের বক্তব্য, ''মূল্যবোধই আমাদের বলে দেয় আমরা কেমন লোক এবং আমাদের চরিত্রই বা কেমন। তবে আমি মনে করি ধরা বাঁধা নীতি ও মূল্যবোধের জীবনে আটকে থাকার চেয়ে তা পরিবর্তনশীল হলেই ভাল। সুখে-শান্তিতে থাকতে এগুলোর নিজস্ব পথ ধরে আসাই বাঞ্ছনীয়। অন্য কেউ তোমাকে বলে দেবে কোনটা অনুসরণ করতে হবে, সেটা মোটেই উচিত নয়।''

উপরোক্ত সমস্ত বক্তব্যগুলিই মূল্যবোধের জয়গানে মুখরিত। প্রত্যেকের পেশা ভিন্ন কিন্তু সনাতন বেদের মতোই যেন মূল্যবোধের শাশ্বত রূপ এঁদের সাফল্যকে একসূত্রে গেঁথে দিয়েছে। সাফল্যের মূলমন্ত্রকে স্বীকার করে নেওয়ার সৎসাহস যদি বিচারের পরাকাষ্ঠা হয় তবে চার ভিন্ন ক্ষেত্রের ওই চার কৃতী অবশ্যই 'অন্যরকম' আর সুমহান হিন্দুস্থানের শাশ্বত পরম্পরা যদি এদের মধ্যে প্রতিফলিত হয় তবে এই 'মূল্যবোধ'টাই নিঃসন্দেহে 'অন্যরকম'। এর বিচারের ভার রইল পাঠকবর্গের ওপর।

রাজনীতিতে কেলেঙ্কারী

অতিথি কলম

যোগিন্দর সিং

১লা সেপ্টেম্বর থেকে নিখোঁজ থাকার পর সম্প্রতি খুন হয়ে যাওয়া নার্স ভানোয়ারী দেবীর সঙ্গে রাজস্থানের জলসম্পদ মন্ত্রী মহীপাল মাদেরনার অবৈধ সম্পর্কের জেরে রাজস্থান সরকারের অস্তিত্বই হঠাৎ সংকটে পড়ে যায়। খুনের ব্যাপারে তাঁর জড়িত থাকার দায় অস্বীকার করলেও মদেরনা ভানোয়ারী দেবীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কথা মেনে নিয়েছেন। এরই পরিণতিতে এক অভাবনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। রাজস্থান সরকারের সব মন্ত্রীই একসঙ্গে পদত্যাগ করেন। মন্ত্রী মদেরনার অকুতোভয় স্ত্রী অবশ্য টেক্কা দিয়ে বলেছেন কারুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে একটি সি ডি তৈরি করলেই কেউ অপরাধী হয়ে যায় না।

এখানে বলা প্রাসঙ্গিক যে বিশ্ব বা সেই অর্থে ভারতীয় রাজনীতিতে ৩৬ বছর বয়সী নার্সের সঙ্গে প্রায় বৃদ্ধ মন্ত্রীর জড়িয়ে পড়া প্রথম বা অন্তিম ঘটনা নয়। যৌনতার ব্যাপারে মানুষমাত্রই কৌতূহলী। কেউ একটু প্রকাশ্যে, কেউবা লুকিয়ে-চুরিয়ে। জাতিগতভাবে আমাদের অবস্থান অনেকটাই অদ্ভুত ও দোলাচলে ভরা। আমাদের আদালত বিবাহবন্ধন ছাড়াই একসঙ্গে বসবাসকে মান্যতা দিলেও সমাজের গরিষ্ঠাংশের কাছে এটি এখনও ব্যতিক্রম হিসেবেই গণ্য।

২০০৫ সালে দক্ষিণী অভিনেত্রী খুশবু একটি বিস্ফোরক ঘোষণায় বলেছিলেন কোনও মেয়ে তার বিবাহপূর্ব সম্পর্কে যৌনতাকে প্রশ্রয় দিতেই পারে যতক্ষণ না তা কোন অনভিপ্রেত সন্তানসম্ভাবনার সৃষ্টি করছে। পরিণামে তাঁর বিরুদ্ধে দু' ডজন মানহানির মামলা দায়ের হয়।

অবশ্য ২০১০ সালে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চ ২২টি মামলাকেই খারিজ করে দিয়ে বলেন বিবাহ-বহির্ভূত যৌনতা ও বসবাস বিষয়ে শ্রীমতী খুশবুর ধারণা ও মত তাঁর একান্তই ব্যক্তিগত। ভারতীয় সংবিধান তাঁর সেই মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে সাধারণ গড়পড়তা কোনও লোক যৌন-বিচ্যুতি ঘটালে তা নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামায় না। কিন্তু মানুষ তার ওপরওয়ালার (শাসকের) কাছ থেকে তথাকথিত নৈতিক দায়বদ্ধতা আশা করে। পৃথিবীর ইতিহাসে যৌন উন্মাদনার পরিণতিতে বহু সিংহাসন টলে গেছে, ধূলিসাৎ হয়েছে অনেক সাম্রাজ্য। বিদেশের একটি সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে সামাজিক পরিবেশে গোপনীয়তা ও তুলনামূলকভাবে নিরাপদ সঙ্গী পেলে বিপুল সংখ্যক মানুষই অকাতরে অন্যায় যৌন সম্পর্কে প্রশ্রয় দেবে।

কিছু কিছু ভারতীয় রাজনীতিবিদের আচরণ এই প্রসঙ্গে নজর করা যেতে পারে।

(১) ২০১০ সালে কর্ণাটকের ভূতপূর্ব খাদ্যমন্ত্রী হরতালু হলাপ্পা তাঁর বন্ধুর স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

(২) ২০০৯ সালে একটি গোপন ক্যামেরায় তৎকালীন অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল ও অশীতিপর কংগ্রেস নেতা নারায়ণ দত্ত তেওয়ারীকে রাজভবনের শয্যায় এক সঙ্গে তিন শয্যাসঙ্গিনী সহ অত্যন্ত কুরুচিকর ভঙ্গিমায় প্রকাশ করে। পরিণতিতে তাঁর রাজ্যপাল পদ যায়। যদিও এই পদত্যাগ অন্য একটি পিতৃত্ব প্রমাণ সংক্রান্ত মামলায় শ্রী তেওয়ারী জড়িয়ে পড়ার পরে পরেই ঘটে। একই সময়ে একাধারে কেরালার কংগ্রেস নেতা ও চিত্রতারকা রাজমোহন উন্নিস্মান অবৈধ যৌন ক্রিয়াক্রর্মে লিপ্ত থাকায় গ্রেপ্তার হন। পরে অবশ্য জামিনে ছাড়া পেয়েছেন।

(৩) ২০০৮ সালে ওড়িশার তৎকালীন রাজস্ব ও দুর্যোগ মোকাবিলা মন্ত্রী নিজেই যৌন-কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার দুর্যোগে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

(৪) ২০০৩ সালে উত্তরপ্রদেশের পূর্ণমন্ত্রী অমরমণি ত্রিপাঠীর কথা হয়ত অনেকের মনে পড়বে। দীর্ঘ স্বীকার, অস্বীকার, হুমকি পর্বের পর নিজের অন্তঃসত্ত্বা সঙ্গিনীকে খুন করার অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় তিনি এখন যাবজ্জীবন জেল খাটছেন।

একই বছরে উত্তরাখণ্ডের ভূতপূর্ব রাজস্ব মন্ত্রীর সঙ্গে অসমীয়া বংশোদ্ভূত এক অবিবাহিত মেয়ের অবৈধ সম্পর্ক ধরা পড়ে। সি বি আই এই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা রুজু করলেই তিনি পদত্যাগ করেন।

এই তালিকা অবলীলায় দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে যাবে। তবে উল্লেখিত উদাহরণগুলি থেকে এটা বোঝা যায় যে একটু মওকা পেলেই কাতারে কাতারে যৌন-বুভুক্ষু এই কামযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে

পড়বে। এবারে স্বদেশী ছেড়ে একটু বিদেশী রাজনীতিকদের ওপর ক্যামেরা ঘোরানো যেতে পারে।

(১) নিউইয়র্কের রাজ্যপাল ইলিয়ট স্পিটজার পতিতাবৃত্তি সংক্রান্ত এক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পদত্যাগে বাধ্য হন।

(২) ভূতপূর্ব আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন হোয়াইট হাউস কর্মী মণিকা লিউনস্কির সঙ্গে দীর্ঘ যৌনাচারে লিপ্ত থেকে 'বিশ্বখ্যাত' হওয়ার আগে আরকানসাস রাজ্যের পাওলা জোনস-এর ওপরও যৌন নির্যাতনে অভিযুক্ত হয়েছিলেন।

(৩) একেবারে সম্প্রতি ১৯৯০ সালে ইসরাইলের পর্যটন বিভাগের এক কর্মীকে ধর্ষণের অপরাধে সে দেশের প্রেসিডেন্ট Monhe katsov-কে পদত্যাগ করতে হয়। ২০১১ সালে আদালতের রায়ে তিনি ৭ বছরের সাজা খাটছেন।

(৪) যৌন কেলেঙ্কারি কাণ্ডে হালফিল ভূতপূর্ব হওয়া ইতালীর প্রধানমন্ত্রী সিলভিও বার্লুসকনি দুরাচার কুলপতির সম্মানে ভূষিত। তিনি পতিতাবৃত্তিতে প্রশ্রয় দেওয়া ছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর আবাসস্থলের মধ্যে নাবালিকার সঙ্গে কদাচারে লিপ্ত হওয়ার মতো ঘৃণ্য কাজে অভিযুক্ত। তাঁর বিচার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার অপেক্ষায়।

মজার বিষয় হচ্ছে ধরা পড়ার পর শুধু রাজনীতিবিদ্‌রাই নন, অন্য গড়পড়তা অভিযুক্তও কেলেঙ্কারির সঙ্গে তাদের ভূমিকা সরাসরি অস্বীকার করেন। রাজনীতিবিদ্‌রাও অবশ্যই সমাজের অঙ্গ ও সেই সুবাদে মনুষ্য চরিত্রের অবশ্যম্ভাবী অনুষঙ্গ যৌন-বিচ্যুতি থাকাটা বিচিত্র নয়। তবে হাতেনাতে ধরা পড়লেও তাঁরা সমস্ত কুকীর্তিকে সরাসরি অস্বীকার করার স্পর্ধা দেখান বা সুবিধেজনক-ভাবে বিরোধী দলের চক্রান্ত বলে চালাবার অপকৌশল নেন।

চরম ধিক্কারগ্রস্ত ভারতীয়দের আজ বিশ্বাস জন্মে গেছে যে দেশের রাজনীতিবিদ্‌রা যে কোনও কু-কর্ম করেই অনায়াসে পার পেয়ে যেতে পারেন। আমজনতার চিন্তায় দুর্নীতি ভারতবর্ষে প্রথম স্থানে অধিষ্ঠান করছে। পরেই রয়েছে যৌন কেলেঙ্কারি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি— অনেক সময়ই যৌনতা দুর্নীতিরই একটি অংশ হিসেবে কাজ করে। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় কোনও কাজ অসদুপায়ে হাসিল করতে প্রথমেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে যৌন প্রলোভনে জড়িয়ে দেওয়া হয়। গোটা ডিলে এটি অনেকটা পার্ট-পেমেন্টের কাজ করে।

এখন প্রশ্ন ওঠে কেলেঙ্কারি কি? এই সংক্রান্ত কোন নির্দেশিকা কিন্তু নেই। তবে সাধারণভাবে বিশ্বস্ততা ও নৈতিক মূল্যবোধকে অগ্রাহ্য করে প্রতিষ্ঠিত সুনাম ও মর্যাদাকে আঘাত করার মতো কাজ-কর্মকেই কেলেঙ্কারি বলা যায়। তবে রাজনীতির ক্ষেত্রে কেলেঙ্কারিকে বিতর্কিত বিষয় বা জনপ্রিয় নয় এমন বিষয়ের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসালে হবে না। সরকারি অনেক সিদ্ধান্তই বিতর্কিত বা জনপ্রিয় নাও হতে পারে, তার মানে এই নয় সেগুলি কেলেঙ্কারির পর্যায়ভুক্ত।

সেই কারণে এই সংক্রান্ত সঠিক নির্দেশিকা হতে পারে যে কাজটিকে আপাতদৃষ্টিতে বেআইনি বলে মনে হচ্ছে কিনা বা সেটি আদতে সত্যিই বেআইনি কিনা? একজন স্বচ্ছ রাজনীতিবিদের কাছ থেকে এটাই প্রত্যাশিত যে আইনের প্রতিষ্ঠিত অনুশাসনগুলি তিনি মেনে চলবেন কেননা আইনকে লঙ্ঘন করা অবশ্যই বেআইনি, তাই সেটি অবশ্যই কেলেঙ্কারি পর্যায়ভুক্ত। আজকাল অনেক সময়ই দেখা যাচ্ছে ভুল বোঝাবুঝি প্রচলিত নীতি ভাঙ্গা, অপ্রমাণিত অপরাধ ইত্যাদি নিয়ে হইচই করে অনেক ক্ষেত্রেই সংবাদ মাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। কিন্তু সত্যিসত্যিই যদি আইনভাঙা হয় বা অপরাধকে ধামা চাপা দিতে আবার নতুন একটি বেআইনি কাজ সংঘটিত হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই কঠোরতম শাস্তি প্রদান করাই জরুরি। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিই পরবর্তী অপরাধ সংঘটিত হওয়াকে রুখতে পারে। ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির পথকে কলুষমুক্ত করতে তা একান্ত প্রয়োজনীয়। নইলে রুদ্ধশ্বাসে রসালো কেলেঙ্কারির কাহিনী পাঠ ও আরও দ্রুতগতিতে তা বিস্মৃত হওয়াই সার হবে। ***(লেখক : সি বি আই-এর প্রাক্তন অধিকর্তা ও বিশিষ্ট লেখক)***

জোটের আয়ু কমছে, চলছে ঘুঁটি সাজানোর খেলা

প্রিয় পরিবর্তনকামী মানুষেরা
পশ্চিমবঙ্গ

খেলাঘর তবে ভেঙে গেল আজ...। এমন গানই এখন আপনাদের ভরসা। শরিক কংগ্রেসকে শেষ জবাবটা দিয়েই দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য সরকারের সঙ্গে না পোষালে জোট ছেড়ে বেড়িয়ে যেতে পারে কংগ্রেস। দরজা খোলা আছে। অনেক সাধের জোট সরকার তবে ভাঙনের মুখে? এই প্রশ্ন এখন রাজ্যের আকাশে-বাতাসে। এই পত্রলেখকের মনে অবশ্য অনেক দিন থেকেই ছিল এমন একটা প্রশ্ন। বারবার নানা কারণে এবং অকারণে সেকথা খোলাখুলি খোলা চিঠিতে লেখাও হয়েছে। এবার বুঝি শেষ পেরেকটা পোঁতা হয়ে গেল। শুরুটা হয়েছিল পঞ্চায়েত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের অভিযোগ দিয়ে। এরপর একের পর এক ইস্যুতে রাজ্য সরকারের সরাসরি বিরোধিতায় নামে কংগ্রেস। ধানের সংগ্রহ মূল্য এবং ইন্দিরা ভবনের নাম বদল ইস্যুতে রায়গঞ্জ, বহরমপুরের বিরোধী সুর নেমে আসে কলকাতাতেও। দীপা দাশমুন্সি, অধীর চৌধুরীদের আক্রমণাত্মক ভাষা শোনা যায় প্রদীপ ভট্টাচার্যদের মুখেও। এরপর রায়গঞ্জ কলেজের ঘটনার প্রতিবাদে এস এফ আইয়ের সঙ্গে পথে নেমেছে কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনও। এতদিন জোট শরিকের এহেন বিরোধীপনা মুখ বুজে সহ্য করলেও শেষে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেই দিলেন, সিপিএমের সঙ্গে কংগ্রেস থাকতে চাইলে জোট ছাড়ার দরজা খোলাই আছে। এর ঠিক ক'দিন আগেই কলকাতার ধর্মতলায় কংগ্রেসের ধর্ণা মঞ্চে সাংসদ দীপা দাশমুন্সি হুমকি দিয়েছিলেন, কেন্দ্র সরকারের জোটে থেকে তৃণমূল নীতির বিরোধিতা করলে কংগ্রেসও এ রাজ্যে বিরোধিতা চালিয়ে যাবে। কেন্দ্রে যেসব ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধিতা করছে সে প্রসঙ্গে আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন যে, তৃণমূলের ইস্তাহারেই সেসব নীতির কথা বলা ছিল। সব জেনেই তাঁদের জোট সঙ্গী করেছে কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রীর মনে হয়েছে রায়গঞ্জের অধ্যক্ষ নিগ্রহের পিছনে সিপিএম ও কংগ্রেস এক জোটে চক্রান্ত করছে। ছোট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের ভাবমূর্তি নষ্ট করাই উদ্দেশ্য। অধ্যক্ষকে পেটানোটা ছোট ঘটনা? এ তো সেই বাম আমলের বিখ্যাত কিংবা কুখ্যাত 'এমন তো কতই হয়' ডায়লগের রিপ্লে যেন। একেই কি বলে পরিবর্তন? এটাই তো ভাবছেন আপনারা মানে পরিবর্তনকামী মানুষেরা?

সামনেই পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। এর মধ্যে উত্তরপ্রদেশে প্রার্থী দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, মণিপুরেও লড়বে দল। আর সেই ভয়েই রাজ্যে পরিকল্পিত বিরোধিতার খেলায় নেমেছে কংগ্রেস। মনমোহন সিং সরকারের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, তিস্তা জলবন্টন চুক্তি, খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগ, লোকপাল লোকায়ুক্ত নিয়োগ ইস্যুতে সরাসরি বিরোধিতায় নেমে একাধিকবার ইউ পি এ-কে চাপে রেখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাততালি দিয়েছেন আপনারা। বলেছেন এই না হলে নেত্রী? এই না হলে জনদরদ? কিন্তু যাদের হাত ধরে ক্ষমতায় আসা তাদের সঙ্গে যিনি বা যাঁরা এক কথায় আড়ি করে দিতে পারেন তাদের কাছ থেকে কি সত্যি সত্যি দরদ আশা করা যায়?

শরিক কংগ্রেসকে দরজা দেখিয়ে দেওয়ার পর অনেকটাই বিপাকে পড়ে যায় বিধান ভবন। সিপিএমের সঙ্গে জোট করতে চাইলে সরকার ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পারে কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বার্তার জন্য যেন প্রস্তুত ছিল না প্রদেশ কংগ্রেস। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বরাভয় পেয়ে রাজ্য কংগ্রেস লাগাতার সরকার বিরোধী আন্দোলনে সামিল হলেও মুখ্যমন্ত্রী যে সরাসরি এমন মন্তব্য করবেন সেটা সম্ভবত আঁচ করতে পারেনি বিধান ভবন। পরে এনিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বেশ সতর্ক প্রদেশ কংগ্রেস তাই সিদ্ধান্তের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হাতে ছেড়ে দেন।

কেন্দ্র বা রাজ্যে মূল ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে নানা ইস্যুতে সংঘাত নতুন কিছু নয়। বারবার এমন সঙ্কটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন পেতে (পড়ুন তেল মারতে) সক্রিয় হতে দেখা গেছে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বকে। রাজ্যে সরকার চালাতে তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে কংগ্রেসের সেভাবে গুরুত্ব না থাকলেও ২৫ সাংসদের তৃণমূল কংগ্রেসের ওপর অনেকটাই নির্ভর ইউ পি এ-টু। তাই শীঘ্রই এই জোট জট কাটাতে সনিয়া, মনমোহনের কোনও দূত সক্রিয় হবেন। মন কষাকষি কমাতে কিছুটা দর কষাকষি চলবে। কেন্দ্র কিছু কথা দেবে। তারপর রাখবে না। আবার ক্ষোভ বাড়বে। আবার টানাপোড়েন চলবে।

প্রিয় পরিবর্তনকামীরা জেনে রাখুন, এই চাপের রাজনীতি দিয়ে রাজ্যের লাভ আনতে পারবেন না আপনাদের আমাদের নেত্রী। চটকদার ঘোষণা দেওয়া যাবে। কাজের কাজ হবে না। কংগ্রেসও ঘুঁটি সাজাচ্ছে। অনেক খেলা বাকি। বিজেপি'র শুধু নজর রাখার পালা।

নমস্কারান্তে,
—সুন্দর মৌলিক

গীতার শিক্ষা

স্বস্তিকা ২৬.১২.২০১১ সংখ্যায়, নিজস্ব প্রতিনিধির প্রতিবেদন 'গীতা যুদ্ধে উস্কানি দেয়', রুশদের এই অভিযোগের প্রত্যুত্তরে এই পত্রপ্রেরণ। অর্জুনকে নৈতিক মূল্যবোধ ও কর্তব্য বোধে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত করেছেন— তাতে ধর্মযুদ্ধের কারণে অর্থাৎ স্বদেশ রক্ষায় ক্ষত্রিয়ের যে দায়িত্ব তা পালনের জন্যই উপদেশ দিয়েছেন। ভীষ্ম, দ্রোণ গুরুজন ঠিকই কিন্তু তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু হিসাবে আক্রমণে উদ্যত এবং গুরুজনও যদি আততায়ী হন, তাঁদের বধ অবশ্য কর্তব্য। ক্ষত্রিয়ের দেশ রক্ষাই কাজ। মোহগ্রস্ত হলে চলবে না। আততায়ী বধে পাপও নাই। এবং এ কাজ কিভাবে নির্মোহ হয়ে, কর্মফল ত্যাগ করে কর্মের অনুষ্ঠানের সামগ্রিক দিক একে একে উন্মোচন করে কীভাবে কর্ম জ্ঞানে সমাপ্ত হবে তা ব্যাখ্যা করেছেন। জ্ঞানই গীতার চরম লক্ষ্য— কারণ জ্ঞান ও ব্রহ্ম একই।

কতিপয় রুশ চিন্তাবিদ গীতার মর্মবাণী অনুধাবন করেননি— তাই প্রমাদে পড়েছেন। অবশ্য ইস্কন বা রামকৃষ্ণ মিশন ভগবদ্‌গীতাকে ভাগবত জ্ঞান করেন। 'সর্ব ধর্ম সমন্বয়' অভিপ্রায় কার্যকর করতে গেলে গীতাকে অপব্যাখ্যা করা যাবে না। গীতায় ভগবান বলেছেন, ''সম্মোহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়।'' আমার কারও প্রতি দ্বেষ নাই, কেউ আমার প্রিয়ও নয়, সবাই আমার কাছে সমান। তিনি নির্বের হতেই শিক্ষা দিয়েছেন— কিন্তু কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে নয়। রাজধর্ম পালন অবশ্য কর্তব্য। কর্মের ধাপগুলিও একে একে বলেছেন।

—ভূপতি চরণ দে, সন্তোষপুর, কলকাতা-৭৫।

।। ২ ।।

সাম্প্রতিককালে রাশিয়ার সাইবেরিয়ার তমস্ক শহরের একটি আদালত ভারতবর্ষের সনাতন হিন্দুধর্মের স্তম্ভ স্বরূপ 'প্রস্থান ত্রয়ী' অর্থাৎ উপনিষদ, গীতা ও বেদান্ত'র মধ্যে গীতাকে জঙ্গিগ্রন্থ রূপে উল্লেখ করে নিষিদ্ধ করার দিকে এগিয়েছিল। যদিও কম্যুনিস্টদের স্বভাবধর্ম অনুযায়ী পরে ভুলও স্বীকার করেছে। অতি বিপ্লবের তত্ত্বকথায় গর্বিত হয়েও গীতার ক্লৈব্য নাশক বাণীকে এত ভয়? নাকি, কম্যুনিস্ট ভদকা পান করিয়ে মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে বিপ্লবী বানানোর কৌশল? ভারতের স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বিপ্লবীদের কাছে গীতা ছিল প্রতিজ্ঞালব্ধতার স্তম্ভ। সেইজন্য বৃটিশ শাসকের কোপানলেও গীতাকে পড়তে হয়েছিল।

যা হোক, গীতা ভারতাত্মার শাশ্বত বাণী ও কর্মধারা। সারা পৃথিবী যখন নিদ্রামগ্ন ছিল তখন ভারতীয় ঋষিরা মানবের জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে ব্রতী হয়েছিলেন যীশু খৃস্টের জন্মেরও ৪৫০০ বছর আগে যখন পৃথক গ্রন্থ ঋগ্বেদ লেখা হয়েছিল। সেই মানবজীবন ও জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সূচক যে বাণী লিখলেন তার সূত্র ধরেই তো আজকে গড্‌স পার্টিকলস্ খোঁজা হচ্ছে (সূত্র : দি টেলিগ্রাফ)।

গীতার রচনাকাল, ৯০০ খৃঃপূঃ। মূলত গীতা ধর্মসংস্থাপনার্থায় কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে সঞ্জয় বর্ণিত অর্জুনকে দেওয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী। এই বাণীই ভারতাত্মার শাশ্বত বাণী; যেখানে জীবন-কর্ম-কর্তব্য পরিণতি সুন্দর সুললিত গীত সহকারে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

গীতা তো সৎ + চিৎ + আনন্দ = সচ্চিদানন্দেরই প্রতিষ্ঠা। আজকের কম্যুনিস্টদের মার্কসবাদী হয়ে State shall wither away'র স্বপ্নে বিভোর না হয়ে গীতার : ''যাবদ্‌ভ্রিয়তে জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্/ অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমহতি''- তে বিশ্বাস রাখলেই হয়।

ভারতবর্ষে এই গীতোক্তবাদের চর্চা যুগ যুগ ধরে চলে আসলেও যেদিন ভারতীয় নৃপতিরা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ''We had taken our stand in the midst of great concourse of humanity''র মাঝে সামিল হলো সেদিন থেকে আত্মবিস্মৃতির পর্ব শুরু হলো। বস্তুতঃ বিশ্বের সকল ধর্মই প্রকৃতপক্ষে গীতোক্ত সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতিবাদী ধর্ম। তাই আজকে গীতার উপর আক্রমণ কি আমাদের উপরই আক্রমণ নয়?

—শিবাশীষ রায়চৌধুরী, ধুবুলিয়া, নদীয়া।

যীশুর ভারত সফর

পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ খৃস্টধর্মালম্বীদের একমাত্র দেবতা যীশুখৃস্ট নিয়ে তর্ক-বিতর্ক জমে উঠেছে।

১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৮০ সালে পর্যন্ত অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল 'যীশুখৃস্টের মৃত্যু যা সকলে জানেন ও মানেন তা ভুল।' তর্ক-বিতর্ক প্রচুর হয়েছে। তবে ঐতিহাসিকদের দাবী তাঁরা ১০০ শতাংশ ঠিক। যীশুর মৃত্যু হয়েছে ভারতে এবং দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে। ঘটনা হলো ঐতিহাসিক ও একদল গবেষক তিব্বতের এক গ্রন্থাগারে বহু পুরানো পাণ্ডুলিপি পেয়েছিলেন যা হিব্রু ভাষাতে লেখা। তার অনুবাদে যা দাঁড়ায় তা হলো যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল এটা ঠিক। আইনানুযায়ী নিয়ম হলো যতক্ষণ না মৃত্যু সুনিশ্চিত হচ্ছে ততক্ষণ প্রহরী মোতায়েন থাকবে। মৃত্যু ত্বরান্বিত করার জন্য কাঠের হাতুড়ি দিয়ে মারা হোত আসামীদের।

পাণ্ডুলিপিতে যা পাওয়া যাচ্ছে ''হঠাৎই ঝড়জল শুরু হওয়াতে বধ্যভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল প্রহরীরা। তাঁর (যীশুর) অনুগামীরা এই সুযোগে ক্রুশ থেকে তাঁকে নামিয়ে হাঁটা পথে রওনা দেন। তাঁরা ক্রমে ভারতের মধ্যে কাশ্মীর উপত্যকার এক গহন অরণ্যে স্থান নেন। সেখান থেকে সুস্থ হয়ে ধর্মপ্রচার করতেন। দুরারোগ্য ক্যানসারে তিনি সেখানেই প্রাণ ত্যাগ করেন।'' অর্থাৎ খৃস্টধর্মাবলম্বীরা যা জানেন ও মানেন তা ভুল।

ঐতিহাসিক ও গবেষকদল সেই ম্যাপ ধরে কাশ্মীর উপত্যকার গহন অরণ্যের মধ্যে ছোট একটা সমাধি দেখতে পান, যাতে হিব্রু ভাষাতে যীশুর জন্ম-মৃত্যুর সময় তারিখ ও কারণ লেখা আছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, জন্মের তারিখ খৃস্টান বিশ্বাসের সঙ্গে এক হয় কি করে, দ্বিতীয় প্রশ্ন তিব্বতের গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি ধরে সত্যিসত্যিই তা কাশ্মীরের সঠিক স্থানে লেখা ও দেখা যাবে কেন?

এটি ২৫ ডিসেম্বর ২০১১ সালের বর্তমান পত্রিকাতে রবিবাসরীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। যদিও একথা প্রমাণে লেখকেরই দায় থাকছে বেশি। সুমিত তালুকদার লিখছেন 'যিশুর ভারত সফর'। মূল বিষয়বস্তু কিন্তু প্রায় একই।

—জয়ন্ত ঘোষ, হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগণা।

সিনেমার প্রমোদ আকর্ষণ কমিয়ে দিচ্ছে সাংসদদের কাণ্ডকারখানা

রমাপ্রসাদ দত্ত

পারিবারিক যুদ্ধ দেখার খুব শখ ছিল ধৃতরাষ্ট্রের। কিন্তু জন্মান্ধ ব্যক্তির পক্ষে তা সম্ভব নয়। সঞ্জয়ের সাহায্য নিলেন। তাঁর দূরদৃষ্টি আছে। মনের চোখ দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের পূর্ণ ছবি দেখতে পাবেন তিনি। যেমন দেখছেন সেরকম বিবরণ শোনাবেন ধৃতরাষ্ট্রের পাশে বসে। সঞ্জয়ের মুখ থেকে যুদ্ধের ধারাবিবরণী শুনে মনের মধ্যে ছবির পর ছবি সাজিয়ে নিতে অন্ধ নৃপতির অসুবিধে হয়নি একটুও। অনেকেই বলেন মহাভারতের সঞ্জয়ই হলেন প্রথম ধারাবিবরণীকার।

যুদ্ধের বৃত্তান্ত শোনার ইচ্ছে জনমনে সবসময় থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধ প্রতিবেদকরা রণক্ষেত্রে থেকে খবর পাঠিয়েছেন। তা ছাপা হয়েছে কাগজে। পাঠকরা মন দিয়ে পড়েছেন। কাগজের একটা কপি অনেকজন পড়েছেন গভীর আগ্রহে। আবার শুনেছেনও বহুজন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এদেশে রেডিও এসে গেছে। বেতারে যুদ্ধের বিবরণ প্রচারিত হোত। চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতেন, 'খবর শোনার জন্যে, পড়ার জন্যে নয়।' হয়তো তিনি রেডিওর খবর শুনতেন। কাগজ কেউ পড়ত, তিনি চুপচাপ শুনে নিতেন নিজের খেয়ালে কোনও কাজ করতে করতে। যুদ্ধের ছবি দেখার ঝোঁকও কম নয়। সবাক চলচ্চিত্রের বয়স আশি বছর পেরিয়েছে। চলচ্চিত্রে যুদ্ধের বিবরণ তুলতে গিয়ে অনেক আলোকচিত্রী নিহত হয়েছেন। কাগজের জন্যে স্থিরচিত্র তোলার সময়েও কিছু ফোটোগ্রাফার মারা গেছেন। কিন্তু তাতে যুদ্ধের বিবরণ সংগ্রহে ছেদ পড়েনি। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে উৎসাহ পেয়েছেন সবসময়। যুদ্ধের বিবরণ শোনার পড়ার দেখার লোকজন বরাবরই থাকে।

বড়রকম যুদ্ধের কথা থাক। ছোটোখাটো ঝগড়া-মারপিট দেখার উৎসাহও কম নয়। জনমানস সেদিকে বিশেষ আগ্রহ নিয়ে তৈরি থাকে। দাঙ্গা লাগলে থামাবার লোকজন কম থাকে, তা দূর থেকে অসীম কৌতূহলে দেখার মানুষ সবসময় মেলে। মনে বিপদের আশঙ্কা, প্রতি মুহূর্তে ভয়, তবু আড়াল থেকে হানাহানি প্রত্যক্ষ দর্শনের সুযোগ ছাড়তে চান না অনেকেই। যদি নিজের চোখে দেখার সুযোগ না থাকে অন্যের মুখে জলমেশানো বৃত্তান্ত শোনার মধ্যে উদগ্র কৌতূহল রয়ে যায়। এর থেকে বোঝা যায় আমরা মারপিট ভালোবাসি।

হিন্দি চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ মারপিট। এর সঙ্গে যৌনতা যুক্ত হয়েছে। কাহিনী যাই-ই হোক মারপিট চাই। নায়ক মারামারিতে দক্ষ না হলে দর্শক খুশি হবে না। ইচ্ছাপূরণের ছবিতে নায়ককে সবক্ষেত্রে জিতিয়ে দিতে হবে— এটা চলচ্চিত্র নির্মাতারা সবসময় মনে রাখেন। লোকে পয়সা খরচ করে ছবি দেখবে সেখানে বিনোদনটাই পুরোমাত্রায়। বিনোদনের অন্যতম প্রধান দিক মারামারি। ক্যামেরার কৌশলে তাকে বিশ্বাসযোগ্য রূপ দিতে হবে। পর্দায় ছবি দেখে দর্শক উল্লাসে ফেটে পড়বে তবেই তো বক্স অফিস হিট করবে ছবি। দারা সিং-এর অনেক ছবির একসময় খুব ভালো বাজার ছিল। সেসব ছবির মধ্যে মারপিট প্রাধান্য পেয়েছে বরাবর। এখন সেরকম মোটা দাগের ছবি তৈরি না হলেও রুচি খুব একটা উন্নত হয়েছে— এমন মানা যায় না। বাস্তবসম্মত মারপিট দৃশ্য তৈরির জন্য ভাবনাচিন্তা করতে চলচ্চিত্র নির্মাতারা বাধ্য। ঝানু দর্শকরা জানেন, দৃশ্যগুলো বানানো, কিন্তু বিনোদনের উপকরণ হিসেবে তা দর্শকদের মন ছুঁয়ে যায়। চলচ্চিত্র-দর্শকরা সবসময় সেনসার-না-করা ছবি দেখতে আগ্রহী। সেসব ছবিতে আসল মারপিট থাকে না। মারপিটের সাজানো দৃশ্যের বীভৎস ভয়ঙ্কর রূপ সেনসার বোর্ড দেখানোর ছাড়পত্র দেয় না অনেক সময়েই।

টেলিভিশনে অনেকরকমভাবে মারামারির ছবি চলে আসে। জ্ঞানগর্ভ বা তথ্যসমৃদ্ধ কোন বিবরণ দেখার থেকে বেশি নজর থাকে লড়াইয়ের ছবি দেখায়। বিভিন্ন দেশের রণক্ষেত্রের বিবরণ দেখেন দর্শকরা। সন্ত্রাসবাদীদের বিভিন্ন কাজকর্মের ছবিও দেখেন সাগ্রহে। মুম্বাই নগরীতে টাটাদের হোটেলে যখন সন্ত্রাসবাদীরা ঢুকে পড়ে তখন আমাদের দেশের কম্যান্ডো বাহিনী তাদের কাজ শুরু করে। টেলিভিশনের বিভিন্ন চ্যানেলের লোকজন ধারাবিবরণী দিতে শুরু করেন। লোকজন মজা করে টেলিভিশন দেখতে থাকেন। সেসময় কিছু সচেতন মানুষ বলেন, 'এটা কি করছেন? এতে তো খবর চলে যাচ্ছে সন্ত্রাসবাদীদের কাছে। বন্ধ করুন এভাবে ধারাবিবরণী দেওয়া।' উৎকট প্রমোদপ্রিয় দর্শকরা হতাশ হয়েছেন তাতে।

এখন মারদাঙ্গা সন্ত্রাস প্রমোদ উপকরণ হিসেবে গুরুত্ব পাচ্ছে টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র ঠিকই, কিন্তু দর্শকরা বুঝছেন ওইসবের মধ্যে অনেকটাই ভেজাল ব্যাপার আছে। রয়েসয়ে অনেক রকম ভেবেচিন্তে দেখানো হয়। অত কাটছাঁট হলে দর্শকদের কি মন সবসময় ভরে! দর্শকরা খুঁজছিলেন নতুন প্রমোদ উপকরণ।

হ্যাঁ, তাঁরা পেয়ে গেছেন বিনোদনের নতুন সামগ্রী। টেলিভিশনে দেখার সুযোগ পাচ্ছেন তাঁরা সংসদভবনের ভিতরের ছবি। অধিবেশন চলাকালে যা যা ঘটছে তার আনুপূর্বিক বিবরণ সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে রাখঢাক না করে। আগে বিধানসভা বা সংসদের ভিতর প্রতিবেদকরা থাকতেন। ছবি তোলার অনুমতি সমসময় মিলত না। টেপ রেকর্ডারে যাবতীয় কথাবার্তা ধরার সুযোগ ছিল না। গোপনভাবে রেকর্ড করার চেষ্টা করার মধ্যে ঝুঁকি ছিল। প্রতিবেদকরা যেটুকু পারতেন শুনে লিখে নিতেন। একসময় কাগজে বিধানসভা ও সংসদের অধিবেশনের বিবরণ বেশ ফলাও করে ছাপা হোত। সদস্যদের বিভিন্ন আচরণ তাঁরা লক্ষ্য করতেন। আইন বাঁচিয়ে লিখতেন। সরকারি তরফে লোকজন থাকত, তাঁরা সমস্ত বিবরণ টুকে রাখতেন। অসাংবিধানিক কোন মন্তব্য বা আচরণ সভার অধ্যক্ষ কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিতেন। পরে কাগজে সংসদ ও বিধানসভার বিবরণ প্রকাশের রীতি বা রেওয়াজ উঠে গেল। পাঠকদের কাছে নীরস মনে হওয়ার কারণেই বোধহয় ওইরকম ঘটেছিল।

কিন্তু টেলিভিশনে সংসদের অধিবেশনের সরাসরি সম্প্রচারের প্রথা চালু হওয়ার পর

দর্শকরা বিনোদনের নতুনরকম খোরাক পেয়ে গেলেন। বিজেপি সরকার ক্ষমতা পাওয়ার পর জনস্বার্থে সংসদের অধিবেশন সরাসরি সম্প্রচারের সিদ্ধান্ত নেয়। উদ্দেশ্য ছিল, দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সংসদে কোন্ ভূমিকা নিচ্ছেন সেটা টেলিভিশনের মাধ্যমে দেশবাসী যেন দেখতে পান। সরকারি কর্মীদের নির্দেশ ছিল কোনও কিছু বাদ দেবেন না, যা দেখবেন সব তুলে ধরবেন। অতীতে সাংসদদের শিক্ষা-সহবত-রুচির যে মান ছিল তা দিনে দিনে নেমে গেছে। জনপ্রতিনিধি হওয়ার অধিকার কাজে লাগিয়েছেন এমন অনেক মানুষ যাঁদের সামাজিক অবস্থান গৌরবের ছিল না। অপরাধী, বদমেজাজী, প্রায়-নিরক্ষর একগুঁয়ে কিছু মানুষ জনগণের ভোটে সাংসদ হওয়ার পর স্বরূপ প্রকাশে দেরি করেননি। সাংসদদের রীতিনিয়ম সহবত শেখার ব্যবস্থা থাকলেও তার তোয়াক্কা না করার অভ্যেসই প্রবল ছিল। কথায় কথায় কাঁচা ভাষায় কটূক্তি, মারমুখী হয় তেড়ে যাওয়া, এটা ওটা ছোঁড়া, মারপিট— এসব ব্যাপার ঘটেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। টেলিভিশনের পর্দায় ধারাবিবরণ দেখেশুনে দারুণ মজা পেয়েছেন দর্শকরা। সিনেমাকে হারমানানো সাংসদদের কাণ্ডকারখানা। সিনেমায় যাদের কথা ফলাও করে প্রচার হয়, রাখঢাক করে নামধাম বদলে তারা যখন সাংসদ হয়ে মনের সুখে নৃত্যে বিভোর থাকে এবং যেভাবে ঝগড়া চালায় তা দর্শকদের কাছে আগমার্কা প্রমোদে রূপ নেয়। তাই অনেকে বলাবলি করছেন, বিধানসভা আর সংসদের ভিতরের প্রতিদিনের ধারবিবরণী দেখানোর ব্যাপারটায় ঘটা থাকলে সিনেমার প্রতি দর্শকরা আকর্ষণ হারাবেন।

কারও কারও মত, টেলিভিশনে সব দেখাচ্ছে— এটা ভেবে একসময় সংযত হতেন সংসদ সদস্যরা বাক্যে ও আচরণে। এখন তাঁরা নিজেদের বীরপুঙ্গব মনে করেন। আত্মগর্বে স্ফীত হয়ে ভাবেন, আমি কী হনুরে! বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য হিসেবে মদত মিলছে যা-খুশি আচরণে। আপাত সুভদ্র সাংসদরা ওইসব বদমেজাজি এবং পেশিশক্তিতে বলীয়ান লোকজনকে সামনে রেখে অনেক উদ্দেশ্য সাধন করেছেন, করছেন। যা নিজেরা করতে পারেননি বা অন্যরা করলে অন্যরকম আনন্দ পেয়েছেন। সব দলই পরোক্ষভাবে ওইধরনের কাউকে মদত দেওয়ায় সংসদের মান নেমে গেলেও দেশবাসী দেখেছেন একের পর এক মজার চিত্র। টেলিভিশনে খুব কম খরচে সহজে এমন প্রমোদ উপকরণ মেলায় সিনেমার কল্পিত কাহিনীর প্রতি আকর্ষণ কমতে থাকা স্বাভাবিক। সেটাই ঘটেছে। এরপর হয়তো চলচ্চিত্রকাররা বিভিন্ন ধরনের ঝগড়াদক্ষ সাংসদদের বেছে নেবেন কোন ছবি তৈরির জন্যে। কারণ ঝগড়া মারপিটের আসল অভিনয়ে যোগ্যতা ও দক্ষতায় সাংসদ ও বিধানসভা সদস্যদের ধারে কাছে আসবেন না পেশাদার অভিনেতারা। আর ওইসব ছবি দেশের বাইরে বিপণন করতেও অসুবিধে নেই। প্রতিদিন সংসদের অধিবেশন চালানোর খরচ দুকোটি টাকা। অত কোটি টাকার কিছুটা অন্তত আদায় করা যাবে সংসদ-চিত্র বিদেশে একটুও না কেটে ছেঁটে রপ্তানি করলে। নেতাবাবুরা ভেবে দেখুন।

গুজরাটের কচ্ছ জেলায় নতুন হরপ্পার হদিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পুরাতত্ত্ব আর ইতিহাসপ্রেমীদের কাছে খবরটা বেশ আকর্ষণীয়। গুজরাটের কচ্ছ জেলার কোটরা ভাদালি গ্রামে পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে এমন কিছু উপাদান মিলেছে যা দেখে অনুমান করা হচ্ছে— সবই খৃস্টপূর্ব ৩০০০ বছর আগের। পুণের ডেকান কলেজ আর গুজরাট সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ একযোগে এই অনুসন্ধান চালিয়ে প্রাচীন ইতিহাসের যে সব জিনিস পাওয়া গেছে যা হয়তো হরপ্পার সমকালের। এই ধরনের অনুসন্ধানে এক টুকরো কিছু পাওয়া গেলে নানাভাবে তা যাচাই করে দেখা হয়। ঐতিহাসিক বা পুরাতাত্ত্বিক মূল্য থাকলে খনন কাজ চলে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। অনেকে ভাবেন কাজ চলেছে বড় ঢিমেতালে। কিন্তু এধরনের খনন কাজ তো বাড়িঘর তৈরি আর পুকুর কাটা নয়। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার খনন কাজ যখন চলছে তখন সরকারের পক্ষ থেকে সবরকম নজরদারি ছিল খুঁটিনাটি দিকে। যতদিন গেছে ততই অনুসন্ধান কাজের পদ্ধতি বদলেছে। বিজ্ঞানভিত্তিক সমস্ত অনুসন্ধান পর্বে যন্ত্রের সাহায্য লাগে। তবে যন্ত্রের পিছনে থাকা চাই সক্রিয় ও সজাগ মন। আবেগে ভেসে এই ধরনের কাজ এগোয় না। ডেকান কলেজ আর রাজ্যের পুরাতত্ত্ব বিভাগ ডিসেম্বর মাসে খননের পর সিদ্ধান্ত নেয় জানুয়ারি মাসে আরও বিজ্ঞান ভিত্তিক অনুসন্ধানের কাজ চলবে সেখানে। মাটি খোঁড়ার পর খনিজ সম্পদ বা পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেলে সেখানকার ও আশপাশের অধিবাসীদের সরানোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সেক্ষেত্রে কোনওরকম প্রতিবাদ চলে না। নিশ্চিন্তে এবং বিনা বাধায় এখানেও অনুসন্ধানের কাজ করার জন্যে গ্রামের বাসিন্দাদের অন্যত্র সরানোর ব্যবস্থা হবে।

রাজ্যের পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা ওয়াই এস রাওয়াত বলেছেন, প্রাথমিক খননে যা পাওয়া গেছে তা থেকে অনুমান করা হচ্ছে হরপ্পার শেষ দিকের নিদর্শন, খৃস্টপূর্ব ৩০০০ বছরের। তবে খনন কাজ সামান্যই হয়েছে। তাতে বিস্তৃতভাবে সব কথা বলা সম্ভব নয়। আমরা আরও অনুসন্ধান চালাচ্ছি ঠিকমতো কালনির্ণয়ের ও অন্যান্য তথ্যের জন্যে।

তিনি আরও বলেছেন, আমাদের অনুসন্ধানকে বলা চলে প্রাথমিক পর্বের কাজ। জানুয়ারি মাসে ব্যাপকভাবে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চলবে। এবং সেইসঙ্গে সবরকমভাবে তথ্য সংগ্রহের কাজ। জায়গাটা ঘিরে দেওয়ার পর চলবে অনুসন্ধান কাজ। তখনই বোঝা যাবে খননের মাধ্যমে যেসব তথ্য মিলছে তার পুরাতাত্ত্বিক মূল্য কতটা। যদি প্রমাণিত হয় যা পাওয়া গেছে তা যথাযথ তাহলে জোরদার অনুসন্ধান চলবে। না হলে আরও ভেবে দেখা দরকার। এমনও হতে পারে মাটির নিচে কিছু জিনিস রাখা হয়েছিল সমাজে মানমর্যাদার জন্যে বা তৎকালীন রীতি হিসেবে।

এই আবিষ্কার এখনও রয়েছে প্রাথমিক স্তরে। এখন জায়গাটা ভালোভাবে পরীক্ষা হবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। একথা বলেছেন সরকারি অধিকর্তা। তিনি আরও জানিয়েছেন, এই নতুন হরপ্পার হদিশ মেলায় কোটরা ভাদালি সহ কচ্ছের উত্তর- পূর্বাঞ্চলের গুরুত্ব অত্যন্ত বেড়ে গেছে। পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন ওই অঞ্চলে আরও থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

(সৌজন্য : দি সানডে এক্সপ্রেস)

সকলের মধ্যেই ভগবান বিরাজমান : বৃন্দাবন দাস কাঠিয়াবাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কলকাতার বৈঠকখানা বাজারের মধ্যে অবস্থিত শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ মন্দিরে ১৪ দিনব্যাপী ৫২তম বার্ষিক উৎসব এবং হরিনাম সংকীর্তন, ভাগবত পাঠ এবং ভজন কীর্তনের উদ্বোধন হয় গত ১ জানুয়ারি সন্ধ্যায়। প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের উদ্বোধন করেন মহন্ত ডঃ বৃন্দাবনবিহারী দাস কাঠিয়াবাবা এবং জোড়াসাঁকোর বিধায়ক শ্রীমতী স্মিতা বক্সী। মহন্ত মহারাজ আশ্রমে পদার্পণ করেন মাতৃমণ্ডলীর একত্র উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি এবং অবিরাম পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে। ভগবান শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত হরিনাম কীর্তনের আসরে উপস্থিত গৃহী, সন্ন্যাসী, রাজনীতিবিদ— সবাই। পরে স্বল্প সময়ের প্রবচনে গীতা থেকে উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যা সহযোগে সবার অন্তর স্পর্শ করলেন মহন্ত বৃন্দাবনদাসজী। বললেন, ঈশ্বর সবার অন্তরে বিরাজমান, সর্বত্র বিরাজ করছেন— যিনি এটা অনুভব করেন তিনিই প্রকৃত ভক্ত। যাঁরা দেশের জন্য নিবেদিত প্রাণ, ভারতমাতার সেবায় নিরত তাদেরকে অযথা দোষারোপ নয়। যিনি প্রকৃত নেতা তাঁর অন্তর অপরের কল্যাণের জন্য সদা চঞ্চল। পরে আচার্য বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী সমবেত ভক্তবৃন্দের সামনে প্রবচন দেন। ৩৭-এর পল্লী হরিনাম সংকীর্তন সমিতির পক্ষ থেকে মহন্ত-মহারাজদের, জনপ্রতিনিধি, বিধায়ক, কাউন্সিলার এবং সমিতির পদাধিকারীদের পুষ্পগুচ্ছ এবং ব্যাজ পরিয়ে বরণ করা হয়। ভজন-কীর্তন, প্রবচন, ভাগবত পাঠ, লীলাকীর্তন এবং ৩২ প্রহরব্যাপী তারকব্রহ্ম নাম-এর সমাপ্তি ১৪ জানুয়ারি নগর-কীর্তন শোভাযাত্রার মাধ্যমে হয়। সেইসঙ্গে নরনারায়ণ সেবা ও প্রসাদ বিতরণ হয়।

হরিনাম সংকীর্তন, ভাগবত পাঠ এবং ভজন কীর্তনের আসরে ডঃ বৃন্দাবন বিহারী দাস কাঠিয়াবাবা।

নেতাজী ইণ্ডোর যেন 'নন্দালয়'

শ্রীহরি সৎসঙ্গ সমিতির ভাগবৎ কথা জ্ঞানযজ্ঞ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। যশোদার কোলে নবজাতক শ্রীকৃষ্ণ। নন্দালয়। পাশে বসে নন্দরাজা। তবে স্থান কিন্তু বৃন্দাবন নয়। নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়াম। সমবেত বিশাল ভক্তমণ্ডলীর উৎসাহ-উদ্দীপনা বোধকরি সেদিনকার দ্বাপরের নন্দালয়-এর থেকে কোনও অংশে কম ছিল না। এই অনুপম অপূর্ব সৎসঙ্গ যাঁদের উদ্যোগে কলকাতাবাসীর ইংরেজী নববর্ষের উপহার পাওয়া— সেই শ্রীহরি সৎসঙ্গ সমিতির আয়োজনের উদ্দেশ্য কিন্তু মহৎ। দেশের আটকোটি জনজাতি-বনবাসী শিশু-বালক-বালিকাদের একল (ওয়ান টিচার স্কুল) বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বাবলম্বন ও স্বাভিমান জাগরণের কাজ করে চলেছে। এসময়ে সারা দেশে বন-পর্বত-প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে শ্রীহরি সৎসঙ্গ সমিতির সহায়তায় বনবন্ধু পরিষদের উদ্যোগে ৩৫০০০ একল বিদ্যালয় চলছে। শহরবাসী বনবাসী— আমরা সবাই ভারতবাসী এই দৃষ্টিকোণ থেকেই কলকাতা-হাওড়া মহানগরের আমজনতা এই সেবাকাজে নিজেদের সাধ্যাতীত ঝুলি উপুড় করে ঢেলেছেন। সেজন্য পণ্ডিতপ্রবর কৃষ্ণচন্দ্র শাস্ত্রীর সুললিত কণ্ঠে প্রবচন এবং ভাগবতকথা জ্ঞানযজ্ঞের ব্যবস্থা নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। কথার যাদু আর প্রভাব এমনই যে, সমবেত ভক্তজন— আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ভাববিভোর। গানে গলা মেলাচ্ছেন, গাইছেন। উদ্বেলিত হাজার হাজার শহরবাসী। বাড়ির পরিবেশ ও সংস্কারের প্রভাবে ছোট ছোট বালক-বালিকাও নিজেদের বিলাসিতা ভুলে গুরুজন অভিভাবকদের কাছ থেকে পাওয়া অর্থ জমিয়ে চার অঙ্কের অর্থ এই মহান কাজে ওখানে জমা করে দিচ্ছে। সব মিলিয়ে শ্রীহরি সৎসঙ্গ সমিতির আয়োজন সার্থক।

শ্রীহরি সৎসঙ্গ সমিতির ভাগবৎ কথা জ্ঞানযজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রবচন দিচ্ছেন পণ্ডিত প্রবর কৃষ্ণচন্দ্র শাস্ত্রী।

হিন্দু ছাত্রীদের বিভ্রান্ত করে গোমাংস খাওয়ানো

ক্ষোভের আগুনে পুড়ছে বাংলাদেশ

বাসুদেব ধর : ঢাকা॥ সিলেট অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের ১০৮ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে হিন্দু ছাত্রীদের বিভ্রান্ত করে নিষিদ্ধ মাংস খাওয়ানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। মানব বন্ধন, মিছিল ও সমাবেশ হচ্ছে এই ঘটনার প্রতিবাদে। বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান, ঐক্য পরিষদ ও বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ, সিলেট শাখা এ ঘটনায় দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করা হলেও দোষীদের বিরুদ্ধে এখনও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ঐক্য পরিষদ ও পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের নেতারা আজও বৈঠক করেছেন। জানিয়েছেন, আগামী ৭ জানুয়ারির মধ্যে কর্তৃপক্ষ পদক্ষেপ না নিলে তাঁরা আরও কঠোর আন্দোলনের পথে পা বাড়াবেন।

সিলেট থেকে পাওয়া খবর জানা গেছে, সম্প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ১০৮ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, অনুষ্ঠানে প্রাক্তন ছাত্রীরাও যোগ দেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষে সবার কাছ থেকেই চাঁদা নেওয়া হবে। তখন বলা হয় যে, হিন্দুদের জন্য খাসি ও মুরগির মাংসের আলাদা ব্যবস্থা রাখা হবে। কিন্তু কার্যত তা করা হয়নি এবং মুসলমান ছাত্রীদের সঙ্গে হিন্দু ছাত্রীদের

বসিয়ে নিষিদ্ধ মাংস খাওয়ানো হয়। পরে এ বিষয়টি জানাজানি হলে ক্ষোভে ফেটে পড়ে প্রাক্তনীসহ হিন্দু ছাত্রীরা, এক পর্যায়ে এই ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে গোটা সম্প্রদায়ের মধ্যে। ১০৮ বছর পূর্তি উপলক্ষে গঠিত কমিটির আহ্বায়ক হলেন ডা. শায়লা খাতুন ও সদস্য সচিব নাজমা বেগম। শায়লা খাতুন বর্তমান অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের বোন। সম্প্রতি তিনি জাতীয় অধ্যাপক হয়েছেন।

ঐক্য পরিষদ ও পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ নেতারা বলেছেন, এই ঘটনার মাধ্যমে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে কালিমালিপ্ত করেছেন। আয়োজকরা এ ধরনের স্পর্ধা দেখিয়ে হিন্দু ধর্মালম্বীদের ধর্মীয় অনুভূতিতেই আঘাত করেননি, দেশের অসাম্প্রদায়িক চেতনাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। একটি সর্বজনীন উৎসবে একটি ধর্মের মানুষের জন্য নিষিদ্ধ খাদ্য কখনও খাবারের তালিকাভুক্ত হতে পারে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অসাম্প্রদায়িকতা চেতনা বিকাশে কাজ করবে এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু যদি সেই প্রতিষ্ঠান সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতাকে উৎসাহিত করে তাহলে উদ্বিগ্ন হওয়ার পরিস্থিতি অবশ্যই সৃষ্টি হয়। হিউম্যান রাইটস কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ মাইনোরিটিস সহ আরও কয়েকটি সংগঠন এই ঘটনার নিন্দা করেছে। সর্বজনীন ও সামাজিক অনুষ্ঠানে কোনও সম্প্রদায়ের মানুষকে ক্ষুব্ধ ও ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করে এমন খাদ্য পরিবেশন না করার দাবি জানিয়েছে। এ ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সংস্কৃতি কর্মীরাও।

—সৌজন্যে : দৈনিক স্টেটস্‌ম্যান, ০২.০১.২০১২

অসম : খোদ মুখ্যমন্ত্রী সরব জমি-দুর্নীতি নিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বছরের প্রথম দিনেই সরকারি অফিসার এবং পুলিশ কর্তাদের বিরুদ্ধে 'জমি দখল'-এর অভিযোগ আনলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ। তাঁর কথায় সম্প্রতি কয়েক বছর যাবৎ অসমে জমি নিয়ে দুর্নীতি চরমে উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায় জমি-দুর্নীতি নিয়ে মামলা সাধারণ আদালতে ফয়সালা হতে অনেক বছর লেগে যাচ্ছে। এজন্য সরকার ট্রাইব্যুনাল গঠন করে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে চায়। গত বছর অসম বিধানসভা 'অসম ল্যান্ড গ্রাবিং অ্যাক্ট' পাস করেছে। গত জুলাই মাসে রাষ্ট্রপতির স্বীকৃতিও মিলেছে। অথচ এপর্যন্ত ওই আইনের আওতায় ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন— 'আমরা শীঘ্রই ট্রাইব্যুনাল গঠন করছি।'

প্রতি মাসেই জমি দখলের ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে— বিশেষত গুয়াহাটি শহরে এবং আশপাশের এলাকায়। সাধারণ মানুষ মন্ত্রী, এম এল এ, প্রাক্তন জঙ্গি এবং পরিচিত সমাজবিরোধীদের দিকে আঙুল তুলছে। গত বছরের জানুয়ারি মাসে এই জমি দখলের ঘটনায় একজন সার্কেল অফিসারকে সাসপেন্ড করা হয়। গত সপ্তাহেই সোনাপুরে সরকারি জমি জবরদখলের কারণে জনৈক জমি দালাল ফণী তালুকদার এর বিরুদ্ধে এফ আই আর-এর কারণে গ্রেপ্তার করা হয়। ফণীবাবু ২০১১-এর এপ্রিলে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৭, ৪২৭, ৩৭৯ এবং পার্বত্য এলাকায় পরিবেশ রক্ষা আইনের ১৯নং ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 'এফ আই আর' না নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছেন তাঁর সরকার শীঘ্রই ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত নিয়মনীতি ঘোষণা করবে। কৃষিজমিকে শিল্পের জন্য এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহার রোধে সরকার শীঘ্রই আইন আনতে চলেছে বলে শ্রী গগৈ জানিয়েছেন। সাম্প্রতিক অতীতে বেসরকারি প্রমোটারদের হাতে কৃষিজমিতে শিল্প স্থাপনের ঘটনা নিয়ে রাজ্য জুড়ে তীব্র আন্দোলন হয়েছে। গুয়াহাটি শহরের পূর্বে সোনাপুর এলাকায় ২০০ বিঘা জমিতে সিমেন্ট কারখানা গড়ার বিরুদ্ধে গ্রামবাসীরা আন্দোলনে নেমেছেন। পশ্চিমদিকে শহরের বাইরেই কৃষিজমিতে ডিস্টিলারি গড়ার বিরুদ্ধে প্রবল জনরোষ দেখা গিয়েছিল।

কয়েকটি রাজ্যে রাজ্যসভার প্রার্থী নির্বাচন

২০১৪ পর্যন্ত বড় হেরফেরের সম্ভাবনা নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ইউ পি এ সরকার ভেতর-বাইরের প্রবল চাপে লোকপাল বিল সংসদে পাশ করতে পারলেও রাজ্যসভায় ভোটাভুটিতে না গিয়ে সংসদ-অধিবেশনে ইতি টেনে দেয়। অথচ সরকার নিজেদের অযোগ্যতা ঢাকতে বিজেপি'র ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে। যদিও বিজেপি'র 'লোকপাল' বিল বিষয়ে নিজস্ব দৃষ্টিকোণ আছে এবং বিজেপি কখনই বিরোধী আসনে বসে তাদের আনা সংশোধনী অগ্রাহ্য করা সত্ত্বেও বিল পাস করার ঠিকা নেয়নি। আসলে আসনের সমীকরণই কংগ্রেসকে রাজ্যসভায় ভোটাভুটি এড়িয়ে যেতে বাধ্য করেছে, আদতে ইউ পি এ-২ সরকার রাজ্যসভাতে সংখ্যালঘু। আবার আগামী তিন মাসের মধ্যে রাজ্যসভার ৬৫টি আসন খালি হচ্ছে। এর মধ্যে মনোনীত সদস্যরাও আছেন। তার অর্থ বেশ রকমফের ঘটবে রাজ্যসভার আসন বিন্যাসে। তবে এতে ইউ পি এ সরকারের উল্লসিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের পর ইউ পি এ-র হয়তো আসন আরও কমবে বই বাড়বে না। বিশেষত, উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডের বিধানসভা নির্বাচনের পর। ২০১৪-তে ইউ পি এ সরকারের সময়সীমা যখন সমাপ্ত হবে সেই সময়েও ইউ পি এ রাজ্যসভাতে সংখ্যালঘুই থাকবে।

বর্তমানে রাজ্যসভার ২৪৩ জন সাংসদের মধ্যে ইউ পি এ-এর সদস্য ৯৫ জন। ২ এপ্রিলের মধ্যে ৬৫ জন সাংসদ অবসর নেবেন। দিল্লীর তিনটি আসনে এবং সিকিমের একমাত্র আসনে যথাক্রমে জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্যসভার জন্য নির্বাচন হবে। এছাড়া মার্চ মাসে ১৫টি রাজ্যের ৫৮টি আসনে (রাজ্যসভা) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উপরোক্ত বাষট্টিটি রাজ্যসভা আসনের মধ্যে বর্তমানে ইউ পি এ সরকারের সাংসদদের সংখ্যা মাত্র ২৩টি। তারমধ্যে কংগ্রেসের ১৮, এন সি পি-র দুটি, তৃণমূল কংগ্রেস সিকিম ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট এবং অজিত সিং-এর রাষ্ট্রীয় লোকদলের একজন করে।

রাজ্যসভার ৬৫টি আসন খালি হচ্ছে—২০১৪ পর্যন্ত পরিবর্তন

ইউ পি এ-র আসন সংখ্যা-৯৫টি।
২৩ জন অবসর নিচ্ছেন সত্বর।

যদি কংগ্রেস-এর দারুণ ভালো ফল হয়	কংগ্রেসের যদি খুব খারাপ অবস্থা হয়
উত্তরপ্রদেশ যদি কংগ্রেস-লোকদল জোট ১০০-র বেশি আসন পায় এবং উত্তরাখণ্ডে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে তাহলে রাজ্যসভায় আরও তিনটি আসন পেতে পারে।	যদি ফল ভালো না হয়, উত্তরাখণ্ডে না আসে তাহলে রাজ্যসভায় একটি আসন কমবে। ঝাড়খণ্ডেও আসন কমার সম্ভাবনা।

অন্যান্য রাজ্য : বাংলাতে কংগ্রেসের একটি আসন বাড়বে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের আসন দুটো বাড়বে। ওদিকে হিমাচল প্রদেশে কংগ্রেস একটি আসন হারাবে।

সব থেকে ভালো ফলাফলও যদি আশা করা যায় তাহলে ধরা যেতে পারে 'কংগ্রেস-লোকদল' জোট উত্তরপ্রদেশে আসন্ন রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে সর্বাধিক বিধায়ক সংখ্যা তিন অঙ্কে পৌঁছে গেল। এবং উত্তরাখণ্ডে ক্ষমতা দখল করল। সেক্ষেত্রে রাজ্যসভায় ইউ পি এ-র আসন মাত্র দুটি বাড়তে পারে। অপরপক্ষে তৃণমূলের আসন যদি বাড়ে সেক্ষেত্রে কংগ্রেসই চাপে থাকবে। কেননা, তৃণমূল সরকারে সামিল হওয়া সত্ত্বেও 'লোকপাল ' বিলের বর্তমান অবয়বের তীব্র বিরোধী। যদি বিধানসভাগুলোর সংখ্যাগত চেহারা বর্তমান থাকে সেক্ষেত্রে ইউ পি এ-র একটি আসন কমবে। উত্তরাখণ্ডে বদলের আভাস দেখা যাচ্ছে না। ঝাড়খণ্ডে ভবিষ্যতে দুটো আসন খালি হতে পারে। উত্তরপ্রদেশে দশটি আসন খালি হবে। অবসর গ্রহণকারীদের মধ্যে পাঁচজনই বি এস পি-র, সপা ও বিজেপি-র দুজন করে এবং লোকদলের একজন। যদি লোকদল-কংগ্রেস জোট বিধানসভা নির্বাচনে ১০০টি বা তার সামান্য বেশি আসন পায় তাহলে তারা ওই দশটির মধ্যে তিনটি আসন জেতার আশা করতে পারে। আর উত্তরাখণ্ডে কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে একমাত্র শূন্য আসনটি তাদের পক্ষে যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যসভার পাঁচটি আসন খালি হবে। সেখানে বর্তমানে বামফ্রন্টের চার আর তৃণমূল কংগ্রেসের একজন সদস্য আছেন। সেক্ষেত্রে তৃণমূল আরও দুটি আসন পেতে পারে। তখন রাজ্যসভায় তৃণমূলের সদস্য সংখ্যা ছয় থেকে বেড়ে আট হবে। কংগ্রেস ও বামেদের ভাগে পড়বে একটি করে আসন।

এছাড়া অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার ও মহারাষ্ট্র থেকে ছয়টি, মধ্যপ্রদেশ থেকে পাঁচটি, গুজরাট ও কর্ণাটক থেকে চারটি করে, ওড়িশা ও রাজস্থান থেকে তিনটি করে এবং ছত্তিশগড়, হরিয়ানা ও হিমাচলপ্রদেশ থেকে একটি করে রাজ্যসভার আসন খালি হবে।

বর্তমান নির্বাচন বর্ষে দ্বিবার্ষিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মার্চ মাসে নির্বাচন হবে। পরবর্তী নির্বাচন আবার দু'বছর পরে। তখন আরও বারোটি আসন শূন্য হবে। কেরল-৩, অসম-২ এবং তামিলনাড়ু ছয়টি। কেরল থেকে বর্তমানে কংগ্রেসের রাজ্যসভার আসন ১টি, আরও একটি বাড়তে পারে। অসম থেকে অবসর নেবেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ এবং দীপক কুমার দাশ (অগপ)। এখানে দ্বিতীয় আসনটিও কংগ্রেস জিততে পারে। এখানে দুটি আসন বাড়লেও তামিলনাড়ুতে কমবে। এখানে ছয়টি আসনের মধ্যে (২০১৩-তে শূন্য হবে) দুটি ডি এম কে এবং একটি কংগ্রেসের রয়েছে। বিধানসভায় বিপুল গরিষ্ঠতার কারণে জয়ললিতার এ আই এ ডি এম কে দল ডি এম ডি কে-র সাহায্য নিয়ে ক্লীন সুইপ করতে পারে।

২০১৪-তে রাজ্যসভার ৫৬ জন সদস্য অবসরগ্রহণ করবেন, দেশ তখন লোকসভার নির্বাচনের মুখোমুখি হবে।

বরাক উপত্যকায় বিরাট হিন্দু সম্মেলন

''আমাদের দেশ এখন এক বিরাট সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। জেহাদি শক্তির লক্ষে পরিণত হয়েছে হিন্দুরা, 'জিহাদ' তার বীভৎস চোখ-মুখ সহ ধেয়ে আসছে। শুধু ভারত নয়, ইউরোপের ফ্রান্স, জার্মানী, ইংল্যান্ড আমেরিকাও জিহাদী সন্ত্রাসবাদের শিকার।''

গত ২৫ ডিসেম্বর দক্ষিণ অসমের কাছাড় জেলার কাটিগড়াতে এক বিশাল সমাবেশে ভাষণ প্রসঙ্গে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা অশোক সিংহল উপরোক্ত মন্তব্য করেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে শিলচর থেকে ৩০ কিমি দূরে সিদ্ধেশ্বর মন্দির মেলা ময়দানে এক বিশাল ধর্মমহাসম্মেলনে তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। এটা এতাবৎ এই বরাক উপত্যকায় সর্ববৃহৎ হিন্দু সমাবেশ। শ্রী সিংহল বলেন, জোটবদ্ধ জেহাদিদের মোকাবিলা করতে হলে ভেদাভেদহীন সঙ্ঘবদ্ধ হিন্দু সমাজের প্রয়োজন।

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ হলে শান্তি ও সুস্থিতি আশা করা হয়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের যে, হিন্দুরা নিজদেশেই অবিচার ও পক্ষপাতদুষ্টতার শিকার। স্বাধীনতার ৬৪ বছর বাদেও হিন্দুদেরকে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া চলছে। পাকিস্তানে সেনা ও তালিবানদের মধ্যে বোঝাপড়া করে তালিবানদের হাতেই প্রকৃত ক্ষমতা।

এই আসন্ন সংকট মোকাবিলায় হিন্দুদেরকে প্রস্তুত হতে হবে। পাকিস্তানের মধ্য থেকেই পরিকল্পনা করে ভারতের বিভিন্ন রাজধানী শহরে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে এদেশের অর্থনীতিকে খতম করে দেওয়ার জন্যই। শ্রী সিংহল বলেন, রাম ও কৃষ্ণ যেভাবে রাবণ ও কংসকে বীরত্বের সঙ্গে শেষ করেছিলেন সেভাবেই এই দুষ্ট দানবকে হত্যা করতে হবে। শ্রী সিংহল বরাক উপত্যকায় এলাকা থেকে গোরু-পাচারের ঘটনা, মেয়েদের অপহরণ ও অত্যাচার এবং অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়ের ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়াতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সরকারি কর্তৃপক্ষের অকৃতকার্যতায় তিনি যুগপৎ ক্ষোভ ও উদ্বেগ ব্যক্ত করেন। বিশেষ করে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় এরকম অপরাধের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরাধীরা অনুপ্রবেশ করে সঙ্গীন অপরাধ করে চলেছে। এলাকার গরীব জনজাতি ও চা-শ্রমিকদের প্রতি সরকারের অবহেলার তীব্র নিন্দা করে তিনি বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন বলেন— দেশের সম্পদে মুসলমানদের প্রথম অধিকার, তখন তো এঘটনা ঘটতে থাকবে। ও বি সি-কোটা থেকে মুসলমানদের জন্য চাকরীতে সংরক্ষণকে তিনি তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানান।

সমাবেশ সমাচার

এই চূড়ান্ত তোষণকে তিনি দেশের সংবিধানের মূল আদর্শের অবমাননা বলে অভিহিত করে বলেন। ধর্মের ভিত্তিতে এভাবে সংরক্ষণ দেওয়া যায় না।

শ্রী সিংহল গরীব চা-শ্রমিক ও জনজাতিদের খৃস্ট মতে মতান্তরিত করার জন্য মিশনারীদের দোষারোপ করেন, হিন্দু-সমাজকে সতর্ক ও সজাগ থাকার আহ্বান জানান। সাপ্তাহিক সৎসঙ্গ এবং একল বিদ্যালয়ের কাজ (One Teacher School) আরও ব্যাপক ও প্রসারের জন্য পরিষদ কর্মী, সমর্থক এবং উপস্থিত হিন্দুদের আবেদন জানান। এছাড়া প্রস্তাবিত 'কম্যুনাল এ্যান্ড টার্গেটেড ভায়োলেন্স বিল-২০১১'-কে তিনি হিন্দু-বিরোধী, অন্যদের হিন্দু-বিরোধী প্ররোচনা প্রদানকারী বলে হিন্দু সমাজকে সাবধান করে দেন। কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর অঙ্গুলিহেলনেই এই বিলের খসড়া তৈরি হয়েছে বলে শ্রী সিংহল অভিযোগ করেন।

পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত বিশাল ধর্মসভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাধ্বী নিরঞ্জনা জ্যোতি, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মৃন্ময় মহারাজ, রামকুই জেমি এবং রথীন্দ্র অধ্যাপক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। বরাক উপত্যকায় এতবড় সমাবেশ এর আগে হয়নি।

চর-রাজাপুরে জনসভা

সীমান্ত জনকল্যাণ সমিতির পরিচালনায় গত ২৭ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদের রাণীনগর থানার প্রত্যন্ত সীমান্তগ্রাম চর-রাজাপুর-এ (পদ্মা পেরোলেই ওপারে বাংলাদেশের রাজশাহী জেলা) কেন্দ্রীয় সরকারের হিন্দু বিরোধী Prevention of Communial and Targeted Violence bill, 2011-এর প্রতিবাদে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত জনসভার প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ (কার্ত্তিক মহারাজ)। জলঙ্গী থানার মালোপাড়া গ্রাম থেকে ১০০ মোটর সাইকেল সহ শোভাযাত্রা নিয়ে কাজীপাড়া গ্রাম হয়ে সভাস্থল চর-রাজাপুর গ্রামে পৌঁছোয়। স্বামী প্রদীপ্তানন্দ হিন্দুদের সম্মানের সঙ্গে বসবাস করার জন্য আহ্বান জানান। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন রাইচরণ মণ্ডল। অন্যান্য বক্তার মধ্যে ছিলেন সন্তোষ কুমার সরকার, প্রেমানন্দ মণ্ডল, তাপস কুমার বিশ্বাস প্রমুখ।

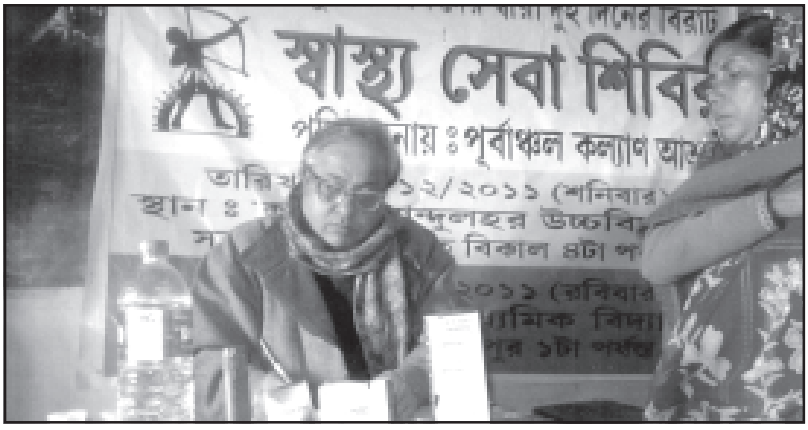

কল্যাণ আশ্রমের স্বাস্থ্য সেবা শিবির

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের পরিচালনায় 'স্বাস্থ্য সেবা শিবির' গত ২৪, ২৫ ডিসেম্বর পুরুলিয়া জেলার, ঝালদা ব্লকের গড়িয়া ও খটঙ্গা উচ্চবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই শিবিরে কলকাতা ও হাওড়া মহানগর থেকে ৬ জন ডাক্তার ও ১৭ জন সাহায্যকারীসহ মোট ২৩ জনের একটি দল গিয়েছিলেন। শিবিরে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা করা হয় এবং ঔষধ দেওয়া হয় বিনামূল্যে। এছাড়াও ৪৩৭ জন রোগীর চক্ষু পরীক্ষা করা ও পাওয়ার নির্ণয় করা হয়। আগামী ২৪, ২৫ জানুয়ারি তাদের চশমা দেওয়া হবে বিনা মূল্যে। দুই দিনের শিবিরে মোট ৯৫০ জন রোগীকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বছর অনুষ্ঠিত 'গ্রামীণ স্বাস্থ্যরক্ষা বর্গের যোগ্যতার বিচারে উত্তীর্ণ ৫ জন স্বাস্থ্য-রক্ষকের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন ডাঃ নরেশ চন্দ্র নাগ।

৯৩তম জন্মদিনে মুরারিমোহন মান্নার সংবর্ধনা

পশুপতি দেবনাথ॥ গত ১৯ ডিসেম্বর ২০১১ মেদিনীপুর জেলার ভবানীপুর থানার বিপরীতে ৪১নং জাতীয় সড়কের দক্ষিণে সরস্বতী শিশু মন্দির বিদ্যালয়ে 'শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতিরক্ষা কমিটি'র উদ্যোগে আজীবন সমাজ সেবক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী মুরারিমোহন মান্নার ৯৩তম জন্মদিবসে সংবর্ধনা জানানো হয়। বহু জটিল রোগাক্রান্ত রোগীকে কলকাতার নামী ডাক্তারদের কাছে ও হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, এ্যাকাডেমিক ও মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রভর্তি, হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করে তিনি মানুষের মন জয় করেছেন। জনসেবামূলক বহু প্রতিষ্ঠানে তিনি যুক্ত থেকে সমাজকল্যাণমূলক কাজ করেছেন। বিনিময়ে কোন আর্থিক সুযোগ কারও কাছে গ্রহণ করেননি। সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপনে তিনি এবং আদর্শ মানুষ। স্বাধীনতাসংগ্রামী হয়েও তিনি কেন্দ্রীয় সরকারপ্রদত্ত পেনসন গ্রহণ করেননি।

১৯৮১-৮২ সালে ''স্বতন্ত্রতা সৈনিক সম্মান পেনসন স্কীম''-এ বহু মানুষকে পেনসন পাওয়ার জন্য সবরকম ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টায় সুতাহাটা, মহিষাদল, তমলুক ও নন্দীগ্রামের বহু মানুষ এই পেনসন পাচ্ছেন। অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি নিজে পেনসন গ্রহণের জন্য দরখাস্ত করেননি। আত্মবিস্মৃত হিন্দু জাতিকে সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি অনুরক্ত হতে এবং মানবসেবায় উদ্বুদ্ধ হতে তিনি বহু স্থানে অনেক সংগঠন গঠন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ আর্য প্রতিনিধি সভা এবং হিন্দু মহাসভার সংগঠক হিসাবে তিনি বৃহত্তর সমাজে সুপরিচিত ব্যক্তি। নির্ভেজাল দেশপ্রেম এবং স্বধর্মের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা রেখে জনগণের কল্যাণ সাধনে তিনি আদর্শ স্থানীয়।

১৯১৯ খৃস্টাব্দের ১৯ ডিসেম্বর অবিভক্ত সুতাহাটা থানার (বর্তমানে ভবানীপুর থানা) চাউলখোলা গ্রামে তাঁর জন্ম। ১৯৪২ সালে আগস্ট আন্দোলন তথা ভারত ছাড়ো আন্দোলনে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর অবর্ণনীয় উৎপীড়ন, ম্যাজিস্ট্রেট প্যাডি সাহেব তৎকালীন জমিদার মান্না পরিবারের বাড়িতে হাতি এনে ঘরবাড়ি, ধানের গোলা এবং আরও বহু জিনিস বিনষ্ট করেছে।

তাঁর জীবন কাহিনী নিয়ে একটি বিশেষ পুস্তক রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ''শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতিরক্ষা কমিটি''।

তাঁর জীবনী সম্পর্কে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন রাধাকান্ত ঘোড়াই, শ্রীধর চন্দ্র দোলুই, রামপ্রসাদ বাগ, নিরঞ্জন প্রামাণিক, কাশীনাথ দাস, মানস জানা, কমলেশ জানা, প্রশান্ত কুমার প্রধান। মুরারিবাবু নিজে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, হিন্দুত্ব এবং হিন্দু আদর্শকে সবাই যদি এগিয়ে নিয়ে যান তাহলে আমার জন্মদিন পালন সার্থক হবে।

বসিরহাট সীমান্তে ধর্মসভা

গত ২৮ ডিসেম্বর উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত তেঁতুলিয়ার নিকট কুলিয়াগ্রামে পূজামণ্ডপ প্রাঙ্গণে সীমা জনকল্যাণ সমিতির ডাকে এক বিরাট ধর্মসভা হয়ে গেল। ধর্মসভায় প্রধান বক্তাদের মধ্যে ছিলেন নবদ্বীপের গৌড়ীয় মঠের সর্বাধ্যক্ষ স্বামী পরাশর মহারাজ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ডায়মন্ড হারবার শাখায় অধ্যক্ষ স্বামী গিরিশানন্দজী মহারাজ, হালিশহর নিগমানন্দ আশ্রমের স্বামীজী মহারাজও ভাষণ দেন। স্বাগত ভাষণ দেন সুকুমার বৈদ্য। হরেকৃষ্ণ মণ্ডল সকলকে ধন্যবাদ জানান।

কলকাতায় প্রথমবার আয়োজিত ‘শিশু চলচ্চিত্র উৎসব - ২০১২’

দেবাদিত্য চক্রবর্তী।। তথ্য সংস্কৃতি বিভাগের শিশু কিশোর আকাদেমীর আয়োজনে ‘প্রথম কলকাতা শিশু চলচ্চিত্র উৎসব’ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সম্প্রতি। কলকাতার কয়েকটি হলে দেশ বিদেশের বেশ কয়েকটি শিশু চলচ্চিত্র দেখানো হলো। সেইদিন ছোটদের উৎসাহ আর হুল্লোড়ে মেতে উঠেছিলো শহর।

ছোটদের কথা মাথায় রেখে একগুচ্ছ অ্যাডভেঞ্চার ছবি দেখানো হলো। এর মধ্যে ছিলো অস্ট্রেলিয়ার তথ্যচিত্র ‘মিরাকল অন এভারেস্ট’-এ একদল অভিযাত্রীর এভারেস্ট জয়ের কাহিনী। ‘লিংকন হল’ নামক ব্যক্তি এভারেস্ট জয় করেন এবং নামার পথে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। সঙ্গীরা তাঁকে মৃত ধরে নিয়ে বেসক্যাম্পে রওনা দিল। কিন্তু অলৌকিকভাবে লিংকন আবার চোখ মেললেন এবং অপর একটি অভিযাত্রী দলের সাহায্যে আবার সমতল মাটিতে পা রাখলেন। তার এই অলৌকিক ভাবে বেঁচে যাওয়াটাই এই ছবির মূল আকর্ষণ।

এরই পাশাপাশি রাতের হিমালয়ের অপূর্ব নিসর্গচিত্র এবং তুষার ঝড় ও তুষার ধসের মতো ভয়ংকর দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছে এই ছবিতে।

অস্ট্রেলিয়ার আরেকটি ছবি ‘সোলো’তে একা একটি মানুষ কীভাবে দুর্জয় সাহসকে বুকে নিয়ে একটি ছোট্ট রবারের ডিঙ্গিতে চড়ে অস্ট্রেলিয়া থেকে নিউজিল্যান্ডের উদ্দেশে সমুদ্র পাড়ি দেয় তার রোমাঞ্চকর সব দৃশ্য দেখানো হয়েছে। ফ্রান্সের একটি ছবিতে আবার নায়ক ‘বোবো’ নামক একটি বাঁদর। বোবো তার মালিককে গাছ থেকে ডাব পেড়ে দেয় আর সেই ডাবের খোসা বিক্রি করে তাদের রোজগার হয়। এক সময় বোবোকে বিক্রি করে মোষ কেনে তার মালিকের স্ত্রী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোবো আবার তার পরিবারের কাছেই ফিরে আসে। এই নিয়েই মনস্পর্শী ছবি ‘গ্যাদারার্স ফ্রম দ্য স্কাই’। একইভাবে মানব সমাজের এক লজ্জাজনক সত্য উঠে এসেছে অমল গুপ্তে পরিচালিত হিন্দি ছবি ‘স্ট্যানলি কা ডাব্বা’ ছবিতে। এই মর্মস্পর্শী ছবিতে পরিচালক শিশু শ্রমিকের মতো বিষয়ে প্রশ্ন জাগিয়েছেন দর্শকের মনে। এর পাশাপাশি বেশ কিছু নির্মল আনন্দদায়ক ছবিও দেখানো হয়েছে এই উৎসবে। যেমন ডেনমার্কের পরিচালক থমাস বোর্চ নিয়েলসন নির্মিত অ্যানিমেশন ছবিতে দেখা যায় কীটপতঙ্গদের জগৎ। কেঁচোদের আধুনিক মানুষের মতো ঘর বাড়ি, স্যুট টাই পরা কেঁচোদের আচার আচরণগুলো দেখতে বেশ লাগে। ছবির নায়ক-কেঁচো ‘বারি’র মা চায় তার ছেলে কর্পোরেট ম্যানেজার হোক। কিন্তু বারির উচ্চাশা সে হবে ডিস্কো তারকা। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে কীভাবে সে সাফল্য পায় তাই নিয়েই মজার ছবি, ‘সানশাই বারি অ্যান্ড ডিস্কো ওয়ার্মস’।

আরেকটি মজাদার ছবি, ‘এলিয়ানা ফনসেকা’ পরিচালিত— ‘এলিয়ানা এমো সেগবেতো ডস্ গলফিনেস’ ছবিটি। এই ছবিটি একটি স্ফটিকের করোটিকে ঘিরে। করোটিটির মজা হচ্ছে, সেটা যার হাতে পড়ে সবাই তার বশ হয়ে যায়। এক দুষ্টুলোকের হাতে পড়ে সেই করোটিটি, তারপর নানান কাণ্ডকারখানার পর ছবির নায়িকা এলিয়ানা কীভাবে সেই করোটিটিকে সমুদ্রের নীচে তার স্বস্থানে ফিরিয়ে দেয়, তাই নিয়েই এই ব্রাজিলীয় ছবিটি। এই ছবিতে ডলফিনের নৃত্য এবং সমুদ্রের তলদেশের দৃশ্য খুবই সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে। এই রকম একশোটির বেশি চলচ্চিত্র নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো উৎসবটি। ছোটদের পাশাপাশি বড়োদেরও যথেষ্ট উৎসাহ চোখে পড়েছে। তবে কয়েকটি বিদেশী ভাষার ছবিতে সাবটাইটেল না থাকায় ছবির সংলাপ ও ঘটনা বুঝতে অনেকেরই অসুবিধে হয়েছে। তবে সব মিলিয়ে শিশু কিশোর আকাদেমীর এই উদ্যোগটি অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে।

জীবনকে ছুঁয়ে যাওয়া ‘ডকুপিক’

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়॥ নৃত্যই যে চলমান জীবনের প্রতীকি রূপকল্প। এই সার সত্যটি দেশে-বিদেশে অভিনিবিষ্ট অনুশীলনে তুলে ধরেছেন নৃত্যনটরাজ উদয়শঙ্কর। তাঁর প্রয়াণের পর ঐতিহ্য পরম্পরার সুদীর্ঘলালিত ধারাটি সযত্নে ধরে রেখেছেন তাঁর সুযোগ্য ভাবশিষ্য তন্বিষ্ঠসাধক শান্তি বসু। মানুষটির জীবন ও কর্মের ওপর নির্মিত তথ্যচিত্রটি সব অর্থেই এক ‘ডকুপিক’ হয়ে উঠেছে। একাধিক তথ্যচিত্রের নির্মাতা সুবীর মণ্ডল এই ছবিতে শান্তি বসু ও তার নৃত্যশৈলীকে এক সিলুয়েট ক্যানভাসে বন্দী করেছেন। গীত-বাদ্য-নৃত্য যে দশ মহাবিদ্যার আকর তা পরিশীলিত প্রয়োগ মুন্সিয়ানায় ছবি ও কথকথার মাধ্যমে অনুপমভাবে বিধৃত করেছেন। টানা ১৭ বছর শান্তি বসু উদয়শঙ্করের ব্যালে ট্রুপের ব্যালেমাস্টার ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শঙ্কর স্কোপেরও অন্যতম পরিচালক ছিলেন। এছাড়া নিজের দল নৃত্যাঙ্গন, অন্যান্য কালজয়ী শিল্পী দলের হয়ে নৃত্য পরিবেশন ও পরিচালনার কাজ করেছেন। এসবই তাঁর ছবিতে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে আপন মাধুকরী ব্যঞ্জনায়। ছবিতে সুরারোপ ও কণ্ঠ দিয়েছেন তার সহধর্মিণী তথা সঙ্গীতশিল্পী লীলা ভট্টাচার্য। তথ্যচিত্রটি প্রযোজনায় সহযোগিতা করেছে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

শব্দরূপ-৬১০ বিশাল গুপ্ত

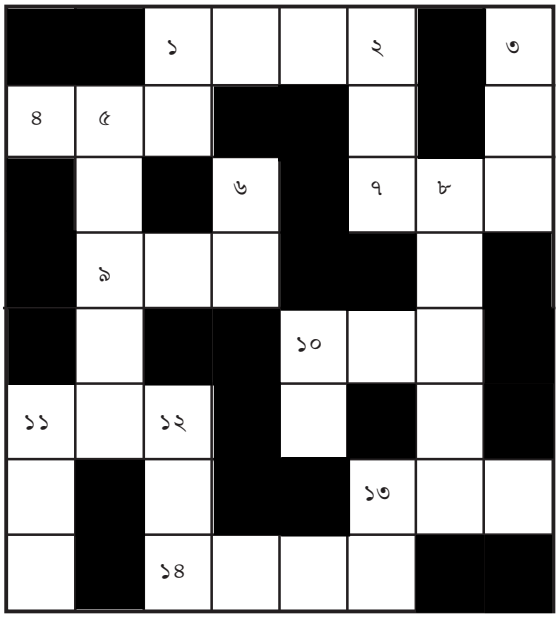

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. একই নামে বশিষ্ঠ মুনির পত্নী ও নক্ষত্র বিশেষ, একে-তিনে দুই চক্ষুহীন, **৪.** চন্দ্রবংশীয় রাজা নহুষের পুত্র, দুই পত্নী এঁর দেবযানী ও শর্মিষ্ঠা, **৭.** ঔৎসুক্য, প্রবল ভাবাবেগ, আগাগোড়া নির্যাস, **৯.** তৎসম শব্দে তুষার, বরফ, শেষ দুয়ে পরাজয়, **১০.** বর্ধমান জেলার একটি শহর, আগাগোড়া অন্ধ, **১১.** গানের দ্বিতীয় কলি, **১৩.** সর্বপ্রথম, প্রথম দুয়ে সৌভাগ্য, **১৪.** অরণ্যের কর্তা বলে পরিগণিত অতি বিশাল বৃক্ষ।

উপর-নীচ : ১. অব্যয় অধিক, বিশেষণে অত্যন্ত, **২.** ব্যাধ, শেষ দুয়ে আশীর্বাদ, **৩.** ঘোড়ার তত্ত্বাবধায়ক ও রক্ষক, **৫.** অন্য নামে চাঁদ, প্রথম তিনে তৎসম রাত্রি, **৬.** ধাতু তৈরির রজ্জু, **৮.** উপাসনা গৃহ, আগাগোড়া ডর, **১০.** শরতের ফুল, **১১.** ইঙ্গ শব্দে ঐকতান বাদ্য, **১২.** শ্রীরামচন্দ্র, **১৩.** স্বামী।

সমাধান
শব্দরূপ-৬০৮
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

হি	র	ণ্য	ধ	নু			ভা
	ণ			পূ			স্ক
	ভে			র	বি	ক	র
অ	রি	ত্র			র		
		স			জা	র	ক
বি	শা	র	দ			ম	
ক			ধী			র	
র্ণ			চি	র	কু	মা	র

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৬১০ সংখ্যার সমাধান আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ সংখ্যায়

।। চিত্রকথা।। শ্রীরামের পূর্বপুরুষ দিলীপ।। ৭

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

হিন্দুদের পকেট কেটে মুসলমানদের লিল্লাইর বাক্স পূর্ণ হচ্ছে

শিবাজী গুপ্ত

বৃদ্ধ বয়সে ছোটবেলার স্মৃতি মনোজগতে ভেসে ওঠাই স্বাভাবিক। তার উপর যদি মুসলিম-অধ্যুষিত এলাকার অধিবাসী হবার অপরাধে খণ্ডচন্দ্র সেবকদের হাতে অর্ধচন্দ্র খেয়ে পালিয়ে আসতে হয়, সে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা কি ভোলা যায়?

সেকালে মুসলমান পাড়ার ভেতর দিয়ে যাতায়াতকালে দেখতে পেতাম মসজিদ বা মাদ্রাসার সামনে রাস্তার ধারে কাষ্ঠ খণ্ডের গায়ে একটা ছোট বাক্স ঝুলিয়ে রাখা হোত। তার গায়ে লেখা থাকত 'লিল্লাই'র বাক্স' অর্থাৎ মসজিদ বা মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহের জন্য দান-খয়রাতের বাক্স। পথচারী মুসলমানরা মাঝেমাঝে দু'এক পয়সা সেই বাক্সে ফেলত ছওয়াত (পুণ্য) অর্জনের আশায়।

তারপর ষাট বৎসরাধিককাল গত হয়েছে। ওইসব পাড়া পথঘাট মাদ্রাসা মসজিদ লিল্লাইর বাক্স স্মৃতিপট থেকে মুছে গেছে। কিন্তু ইদানীংকালে দেশের রাজনৈতিক দলগুলির রকমসকম দেখে সেই ধূলিধূসরিত স্মৃতি চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে ভেসে উঠছে। বৃদ্ধকালে শিশুকাল ফিরে আসছে।

ভারতকে এখন আর সমস্যাসঙ্কুল দেশ বলা যায় না কিছুতেই। তার সব সমস্যা মিটে গেছে। সীমান্ত-সমস্যা বলে কিছু নেই, কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। অন্ন সমস্যা, বেকার সমস্যা ঘুচে গেছে। শিক্ষা সমস্যা, স্বাস্থ্য সমস্যা মুছে গেল বলে। রাজনৈতিক সঙ্কট বলে কিছু নেই। অর্থ সঙ্কট, বাণিজ্য ঘাটতি—ওসব নিয়ে সরকার মাথা ঘামায় না। নোট ছাপাবার ক্ষমতা ও মেসিন যখন হাতে আছে! কিন্তু এদিকে যে সত্যিই দেউলিয়া অবস্থায় পৌঁছেছে সে খেয়াল নেই। ভোটের, বিশেষত মুসলমান ভোটের জন্য কেন্দ্রীয় এবং কোনও কোনও রাজ্য সরকার মুসলমানদের জন্য লিল্লাইর বাক্স বা দানপত্র খুলে বসেছে। দেশ উচ্ছন্নে যাক, সমাজ ধ্বংস হোক ক্ষতি নেই, গদি থেকে পাছা যেন বিচ্যুত না হয় সেদিকে ষোল আনা নজর। সারা দেশেই রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এ বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে মুসলমানদের ভোট বাগাতে পারলে গদি থেকে হটাবে কোন্ 'হালায়? সুতরাং ভোট প্রক্রিয়াকে যতদূর সম্ভব ইসলামীকরণ করতে হবে। তার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অর্থ ভাণ্ডার উজাড় করে দিতে হবে এবং এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ এবং সে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। মুসলমানদের লিল্লাইর বাক্স ভরতি করতে হিন্দুদের পকেট কাটার ব্যবস্থা হচ্ছে। কোনও হিসাব নেওয়া হচ্ছে না মুসলমানরা কত টাকা রাজস্ব দেয়, তাদের পেছনে কত টাকা খরচ হয়। কেন্দ্রীয় ও কোনও কোনও রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী যেন ভাণ্ডার উজাড় করে বাবার টাকা মুসলমানদের জন্য খরচ করছে। হিন্দুদের টাকায় হজ, হিন্দুদের টাকায় মাদ্রাসা মক্তব, হিন্দুদের টাকায় পরিবার পিছু ৫/৭টা বাচ্চা, তিন-চারটা বিবি পোষার খরচ চলছে। গোছা গোছা রেশন কার্ড নিয়ে বিপিএল— এর চাল গম চিনি তুলছে, কেরোসিন গায়েব করে চোরাবাজারে বিক্রি করছে। গণ্ডায় গণ্ডায় অমানুষ পয়দা করে সমাজ জীবন দূষিত করছে, রাষ্ট্রজীবনে সঙ্কট ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সুনাগরিকদের জীবন বিষময় করে তুলেছে।

গত ২০ ডিসেম্বর সারা দেশের প্রত্যেকটি সংবাদপত্রে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতীজীর নয়নমনোহর এবং চিত্তাকর্ষক ছবিসহ পূর্ণপৃষ্ঠাব্যাপী মুসলমানদের জন্য তিনি কি করেছেন এবং আর কি করবেন তার ফিরিস্তি প্রকাশ করেছেন। তাতে কত কোটি টাকা খরচ হয়েছে সে খবর জানবার বা জানবার দরকার নেই। আর কমপিউটারের দৌলতে বুড়িকেও ছুঁড়ি সাজাতে কোনও অসুবিধা নেই; পাঠক-দর্শকদের হৃদয় উদ্বেলিত হলেই হলো।

ওই বিজ্ঞাপনের শিরোদেশে বলা হয়েছে—"Under the Leadership of the Hon'ble Chief Minister, Ms. Mayawatije, a brief account of the "Unmatched, Important and Historic tasks" accomplished by the Uttar Pradesh Government for the religious minorities, especially those undertaken in the larger interest of the "Muslim Community", for their progress and prosperity." সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন ও উন্নতির জন্য বলা হলেও আসলে প্রকল্পগুলি যে মুসলমানদের জন্যই গৃহীত ও রূপায়িত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে সেকথা আর গোপন রাখা হয়নি। আরও উঁচু গলা করে বলা হয়েছে যে অন্যান্য সরকারগুলি গত ৪০ বছরে যা করতে পারেনি, মুসলিম প্রেমান্ধ মায়াবতী মাত্র ৪ বছরে সে অসাধ্যসাধন করেছেন এবং আসন্ন নির্বাচনে জিতলে মুসলমান সমাজকে ৪০০ বছর এগিয়ে নিয়ে যাবেন। সংখ্যালঘু তথা মুসলমানদের উন্নতির জন্য এযাবত ৮৭ দফা কার্যসূচী গ্রহণ ও রূপায়ণ করা হয়েছে, তার ফলে ইতিমধ্যেই ২১টি জেলা মুসলমান নিয়ন্ত্রিত জেলায় পরিণত হয়েছে। বাকীগুলিও শনৈঃ শনৈঃ সেপথে এগিয়ে দিল্লীর দিকে তুরন্ত গতিতে ছুটছে। কুত্তা, মুর্গী ও শূয়োরের সঙ্গে কম্পিটিশনে বাচ্চা পয়দা করলে দিল্লী দখলে বেশিদিন লাগবে না। খোদাতালা বরকত দিক।

পৃথিবীর কোনও দেশে এক শ্রেণীর নাগরিকের জন্য এমন দরাজ হাতে টাকা ছিটাবার কোনও ব্যবস্থা আছে কিনা সন্দেহ। অভাব অনটন কি শুধু মুসলমানদের ঘরেই; হিন্দু ঘরে কি গরীব দুঃস্থ কেউ নেই? সরকারি সমীক্ষায় কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্রই মেলে।

দেশে দরিদ্রতম মুসলমানদের সংখ্যা ৫ কোটি। আর দরিদ্রতম হিন্দু রয়েছে ২৩ কোটি। কেন্দ্রে ইউপিএ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ওই ৫ কোটি মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য প্রাণপাত করে চলেছে। হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে সাচার কমিটির সুপারিশ রূপায়ণ করা হচ্ছে। কিন্তু একইরকম অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও স্রেফ হিন্দু হওয়ার কারণে ২৩ কোটি মানুষ যে তিমিরে সেই তিমিরেই... এই সরকার দেশে ফের দ্বিজাতিতত্ত্বের জন্ম দিচ্ছে। কারণ ব্যাঙ্কে ঋণ পাওয়া, বেছে বেছে মুসলমান এলাকায় রাস্তা নির্মাণ, উর্দু স্কুল গড়ে তোলা, স্কলারশিপ ইত্যাদি একঝাঁক প্রকল্পের সুবিধা পাবে ৫ কোটি চরম দরিদ্র মুসলমান। কিন্তু বাকী ২৩ কোটি দারিদ্র্য সীমার নীচে থাকা হিন্দুর জন্য পৃথক ভাবে সরকারের কোনও উদ্যোগ নেই।" (বর্তমান ৮.৯.০৭ : সংগ্রহ— শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় : পশ্চিমবঙ্গ কি বৃহত্তর বাংলাদেশের অঙ্গীভূত হতে চলেছে?) এক কথায় মুসলমানদের গর্ভাধান থেকে কবরে যাওয়া পর্যন্ত সব খরচ রাষ্ট্রকে বহন করতে হবে। ধর্মীয় ও আর্থিক বৈষম্যের এরূপ চরম দৃষ্টান্ত কোনও সভ্য দেশে আছে কি? হিন্দুদের পকেট ফাঁক করে মুসলমানদের "লিল্লাইর বাক্স" ভরা হচ্ছে মায়া-মমতা-সোনিয়াদের রাজত্বে— এতে কোনও দ্বিমত আছে কি?